কৃশানু

শারদীয় তেরশ' পঁচাশি

Saradiya Greetings from :

JIYAJEE COTTON FABRICS

JIYAJEE FABRICS

AUTHORISED WHOLESALE DISTRIBUTOR

M/s. BHARMAL CHAMPALAL

26/4, ARMENIAN STREET,

CALCUTTA-700 001.

Jiyajee Rao Cotton Mills, Birlanagar (Gwalior)

যাত্রা,
নতুন দেশ,
নতুন মানুষের সান্নিধ্য
নয়তো বা ঘরে ফেরা
আনন্দময় দিন খুশীতে উজ্জ্বল হোক
যাত্রা হোক শুভ।

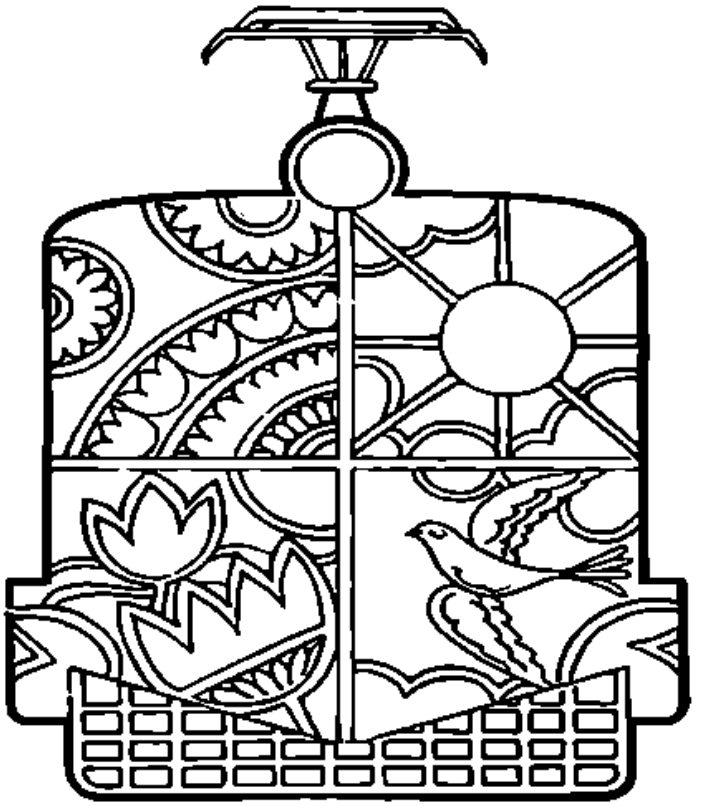

পূর্ব রেলওয়ে

P 29401

With best Compliments of :

S. Sarker & Associates

131/5, Netaji Subhas Chandra Bose Rd.

Calcutta-40

এই শরতে আকাশকে দেখে ঈর্ষা হয় আমাদের। সাদা মেঘের কোনোটা নৌকো, কোনোটা জাহাজ। তরতরিয়ে ছুটে চলেছে নীল সমুদ্রে। কোথাও বাধা নেই। বিশৃঙ্খলা নেই। উন্মুক্ত, অবাধ। অথচ আমরা যারা এই কলকাতা শহরের মানুষ, তাদের চলার গতি প্রতি মুহূর্তে বিপর্যস্ত। এই দুরূহ সমস্যাটাকে মনে রেখেই ভূগর্ভ রেল তার

লক্ষ্যভেদে স্থির।

যানবাহনের জগতে ভূগর্ভ রেল গেঁথে চলেছে এমন এক সুদূরপ্রসারী ভবিষ্যৎ, যখন আমাদের চলার পথ হবে শরতের মেঘের মতই উন্মুক্ত, অবাধ আর বিঘ্নহীন। ভূগর্ভ রেল মানেই গতির প্রগতি।

MTP

কলকাতার নতুন মানচিত্র রচনায়—ভূগর্ভ রেল

মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (রেলওয়েজ)

- কলকাতার দূর-দর্শনকে আরো দূরে—
  আপনার শহরে বা গ্রামে দেখতে চান।
- বাংলাদেশ দেখায় সমস্যা।

টি. এন. কে. টেলিবুস্টার

ব্যবহার করুন

টি ভি অ্যানটেনা—টেলিবুস্টার—কাশেট টেপরেকর্ডার
স্বয়ংক্রিয় ভোলটেজ স্টেবিলাইজার—টি ভি গেমস ও
ডিজিটাল ঘড়ি (ক্লক) প্রস্তুতকারক

টি. এন. কে. ইলেকট্রনিক্স

৯৩/২.বি, বিধান সরণি
কলিকাতা-৭০০০০৪
(ফোন : ৫৫-৬০০৫ ও ৫৫-৭১৪০)

পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্রশিল্প প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত

পশ্চিমবঙ্গে বিক্রয়কর মুক্ত

পুজোয় চাই নতুন জুতো

খোকার জুতো খুকুর জুতো
বাবার জুতো মায়ের জুতো
সবার জন্যে বাটার জুতো

Bata

ওরিয়েন্টা ৩০
সাইজ ৩-৭
টা. ২১.৯৫

কিয়োনা ১২
সাইজ ৩-৭
টা. ৩২.৯৫

Bata

এক্সকুসিভ
ড্রেস স্যান্ডেল ২৭
সাইজ ৫-১০
টা. ৬৮.১৫

কৃশানু

- 'কৃশানু' মুখ্যত নবীন লেখকদের মুখপত্র। কৃশানু'তে রচনা প্রকাশের জন্য তদ্বির করতে হয় না। উন্নত মানের যে কোন মৌলিক রচনা প্রকাশের জন্য সাদরে গৃহীত হবে।
- প্রয়োজনীয় ডাক-টিকিট সঙ্গে না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়।
- প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা। এককালীন চাঁদা ছয় টাকা। নমুনা সংখ্যার জন্য দুই টাকার ডাক টিকিট পাঠাতে হবে।
- পাঁচজন গ্রাহক সংগ্রহকারী, এক বছরের কাগজ বিনামূল্যে পাবেন। পাঁচ কপির কম এজেন্সী দেওয়া হয় না। এজেন্টরা ২৫% কমিশন পাবেন।
- যাদের গ্রাহক-চাঁদা শেষ হয়েছে, তারা গ্রাহক-চাঁদা পাঠান।

মেসার্স পি. কে. নাথ

ডিলার

যাবতীয়—সার, বীজ, কীটনাশক

হাবড়া, ২৪ পরগণা

দশের কল্যাণে

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

With best Compliments of : Phone : 22-1539.

KRISHNA MINERALS

Dealers in Graphite and Industrial Minerals.

15, India Exchange Place, 3rd floor,
Calcutta-700001

With Compliments of :

Phone :—24-3771 Post Box No.—7819

EASTERN TRADERS

45A, Dhiren Dhar Sarani
Calcutta-12

যদি বাসস্থানের জন্য বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন ঃ

কিভাবে বিদ্যুৎ ঘাটতির মোকাবিলা করবেন

খুবই দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে আগামী বেশ কিছুদিন এ রাজ্যে বিদ্যুৎ সংকট থাকবে। অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্যে সবরকম প্রচেষ্টা চালানোর সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতিকে কিভাবে মোকাবিলা করা যায়—সেদিকে নজর দেওয়াটাই ভালো।

কিভাবে মোকাবিলা করবেন ঃ

প্রথমত বিদ্যুতের অপচয় বন্ধ করুন এবং বিদ্যুৎ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হোন। আলোর বাহার এবং আলোর প্রদর্শনী বন্ধ করুন যতটা সম্ভব আলো বা পাখা বন্ধ করে দিন। বিদ্যুৎ অপচয় বন্ধ করুন এবং নিজের খরচ কমান। এই মূলনীতির ভিত্তিতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করলেই বর্তমান পরিস্থিতিকে কিছুটা সামাল দেওয়া যাবে।

অনুগ্রহ করে বিকাল ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত জলের পাম্প, ইলেকট্রিক ইস্ত্রি, ওয়াটার হীটার ইত্যাদি ব্যবহার করবেন না, কারণ এই সময়ে শিল্প কারখানার জন্যে বিদ্যুৎ সবচেয়ে বেশী দরকার।

আইন মেনে চলুন

রাজ্য সরকারের বিধিনিষেধগুলি দয়া করে মনে রাখবেন। সকাল ৯-৩০ থেকে ১১টা এবং বিকাল ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এয়ারকণ্ডিশনার চালানো নিষেধ, অবশ্য যে সব ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার ছাড় দিয়েছেন তাদের কথা স্বতন্ত্র। এছাড়া বিয়ে বা অন্যান্য উৎসব উপলক্ষ্যে নিয়ন, মার্কারী ল্যাম্প বা অন্যান্য উচ্চ শক্তিসম্পন্ন বাতি জ্বালানোও নিষেধ।

'বিদ্যুৎ ঘাটতি' কমিয়ে আনতে আমাদের সাহায্য করুন

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

For Assured Success—

Always Insist on **TIGER** Brand Fertiliser Mixture.

Manufacturer :

M/s. NANDY DEY PRIVATE LIMITED

P.O. SAINTHIA • DIST. BIRBHUM

Gram : 'BEHARIDE' Phone : SNT. 44 & 11

Head Office :

67/49, Strand Road, Calcutta-700010

Gram : 'GLOTBIS' Phones : 33-9711 (4 lines)

CRYSTAL

FOR

WATER TREATMENT PLANT

Range of Crystal's Products

- Pressure Filter
- Gravity Filter
- Iron Removal Filter
- Taste & Odour Removal Filter
- Clarifier and Settling Tank
- Swimming Pool Refiltration Plant
- Hypochlorinator
- Duplex Strainer & Other Equipment

CRYSTAL FILTER COMPANY

33/1/1, Natabar Paul Road,

Howrah-', West Bengal.

Phone : 66-2420

দেখতে ভালো, চলতে আরাম, মজবুত, আর
দামেও সুবিধাজনক, এমন—

জুতো কিনতে চান ?

তাহলে বাড়ীর ছোটোবড়ো সবাইকে নিয়ে চলে আসুন
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের
তপশীলী জাতি ও আদিবাসী কল্যাণ বিভাগের
কলকাতার কেন্দ্রীয় বিপণিতে

২৪৫, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীটের দোতলায়

রকমারী ডিজাইন বাজারের তুলনায় দামও কম

জুতো ছাড়াও এই বিক্রয়-কেন্দ্রে পাবেন
তপশীলী জাতি ও আদিবাসী ভাইবোনদের
তৈরি আরও বহু রকম জিনিস।

**তপশীলী জাতি ও আদিবাসী ভাইবোনদের
তৈরী জিনিস কিনুন। এঁদের কল্যাণকর্ম্মে
সহায়তা করুন।**

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক প্রচারিত

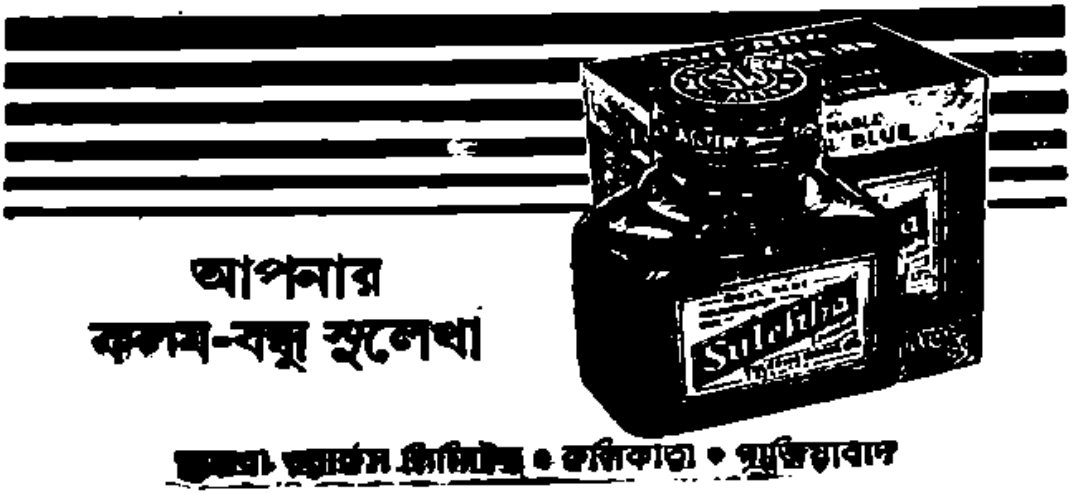

With Compliments from :

UNITED MACHINERY CORPORATION

29A, Netaji Subhas Road
(5th Floor Room No. 17)
CALCUTTA-700001

পশ্চিমবঙ্গ জলে নিমজ্জিত
চোখের-জলে বানের জলে মিশে গেছে
ধনী-দরিদ্র গ্রামনগর একাকার
দেড়কোটি বাঙ্গালী জীবন বিপর্যস্ত
মানুষ ও পশুর প্রাণহানি সংখ্যাহীন
আমরা কে কার পাশে দাঁড়াব ?
আসুন সবাই সবাইর পাশে দাঁড়াই—

—কৃশানু পরিচালক মণ্ডলী

নতুন কিছু কবিতা

আর

নতুন কিছু গল্পের জন্য

কৃশানু

আত্ম মর্যাদা সম্পন্ন নতুন লেখকদের
একমাত্র মুখপত্র

৩০/১-এ, কলেজ রো, কলকাতা-৯

কৃশানু

মননশীল সাহিত্য ত্রৈমাসিক

একাদশ বর্ষ। প্রথম সংখ্যা।

শ্রাবণ—আশ্বিন ১৩৮৫

লেখক সূচী

সম্পাদকীয়

কবিতা

কৃষ্ণ ধর / দাউদ হায়দার / রত্নেশ্বর হাজরা / গৌরাঙ্গ ভৌমিক উজ্জ্বল সিংহ / ঈশ্বর ত্রিপাঠী / গোবিন্দ ভট্টাচার্য / কাশীনাথ দাশ চাকলাদার / ধ্রুব বসু / সুদীপ্ত বিশ্বাস / দেবব্রত দাশ / শংকরজ্যোতি দেব / প্রণব পাল / চিন্ময় দত্ত / শশাঙ্ক হাইত / হৃষীকেশ বিশ্বাস / মীনা ভৌমিক / রথীন কর / দেবাশিস প্রধান / নাসের হোসেন / জীবনময় দত্ত / সুনির্মল বসু—১৭-৩২

গল্প

কিরণচন্দ্র মৈত্র ৩৩ / অশোককুমার সেনগুপ্ত ৫৬ / অজিত হাজরা ৭৫ / অমিয় চৌধুরী ৬৪ / জ্যোৎস্নাময় বসু ৮৪ / বিজনকুমার ঘোষ ৯৬ / পিনাকীরঞ্জন গুহ ১০৩ / অনুপকুমার আচার্য ১১০ / রঘুনাথ মুখোপাধ্যায় ১১৯ / মদন দাশ ১২৩ / সুনীলেন্দু কোনার ১৪১।

'কৃশানু' অনুষ্ঠানের বিবরণী/রত্নেশ্বর বর্মণ—১৪৭

প্রচ্ছদ
শ্রীপ্রভাস

সম্পাদক
দীনেশচন্দ্র সিংহ

সম্পাদকীয়

প্রতি শারদীয় সংখ্যায় কৃশানুর নববর্ষে পদার্পণ। এ সংখ্যায় এগার বৎসরে পড়লো। যথারীতি গল্প-কবিতা সংখ্যারূপেই এ সংখ্যায় প্রকাশ।

বলতে বাধা নেই, অসম লড়াইয়ে পত্রিকার পরিচালকগণ বিপর্যস্ত। এক একটা সংখ্যা প্রকাশের পর তাদের অবস্থা অবর্ণনীয়। পড়ি কি মরি করে ছুটে আসা ক্ষীণজীবি ডেলি-প্যাসেঞ্জারের বুক ধুকপুকুনির সঙ্গেই তার তুলনা চলে।

ছোট পত্রিকাগুলি (লিটল্ ম্যাগাজিন বললে গ্র্যামার বাড়ে) এস্টাব্লিশ-মেন্টের-বিরুদ্ধে মূর্ত প্রতিবাদ, অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সোচ্চার জেহাদ। কিন্তু মুদ্রণ শিল্পে চূড়ান্ত মাৎস্য-নীতির ফলে তারা অনেকেই দেহ-রক্ষা করেছে। বাকী কয়টির প্রাণ-প্রদীপ নিভু নিভু। নতুনের দেখা নেই। অথচ এস্টাব্লিশমেন্ট-পোষিত পত্র-পত্রিকার কি রমরমা! দিন দিন ডাল-পালায় ছড়াচ্ছে। অজন্মার যুগেও নতুন নতুন এস্টাব্লিশমেন্ট-পোষা পত্রিকা গজাচ্ছে। এরা প্রায়শঃ পরস্পর মাসতুতো ভাই। জ্ঞানদায়িনী সম্পাদকীয় দিয়ে এদের শুরু এবং রাশি ফলে সমাপ্তি। ভেতরে অখ্যাত গলির না-চলা রেস্টুরেন্টের বাসি চপের পুর—হরেক রকম স্বাদ, গন্ধ ও বিকৃত রসের সমাহার। একাধিকবার সস্ত ভাজা তো বটেই। সুতরাং জনগণ গিলছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে কোত্তাকুত্তির নামে ছায়ার সঙ্গে লড়াইয়ে মত্ত। তারা যদি বিশিষ্ট ক্ষুদ্র পত্রিকাগুলির মুদ্রণ-ব্যায় সঙ্কুলান হয় মতো বিজ্ঞাপনও বরাদ্দ করেন, তা হলে অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে যুযুধান পত্রিকাগুলি বেঁচে যায়।

এ ব্যাপারে ক্ষুদ্র পত্রিকার লেখকদেরও একটা ভূমিকা আছে। সারা বছরে আমরা কয়েক শ' নতুন লেখকের লেখা পাই। তারা দিল্লী থেকে কাছাড়—ত্রিপুরা পর্যন্ত ছড়িয়ে আছেন। এদের অনেকের লেখা ছাপা হয়েছে—হচ্ছে—হবে; অবশ্য পত্রিকা বেঁচে থাকলে। লেখক ও পাঠকগণ যদি নিজ নিজ এলাকায় দু' পাঁচ জন করেও গ্রাহক সংগ্রহ করে দিতেন, তবে পত্রিকার প্রাণ রক্ষার্থে এমন "এস-ও-এস" ডাক দিতে হতো না। কৃশানু পশ্চিমবঙ্গে নতুন লেখকদের দাঁড়াবার বিশিষ্ট ক্ষেত্র। পত্রিকার লেখক ও পাঠকগণ পত্রিকা না বাঁচালে কে বাঁচাবে? সবাই যদি দেশ-প্রিয় ও অমৃত-লোভী হয়ে পড়েন, তবে ভাগে পড়বে কতটুকু? সর্বত্র জমিদারী জোতদারী-মহাজনী-মালিকানা উচ্ছেদের দিনে কেবলমাত্র সাহিত্যের জগতেই কি তা বজায় থাকবে? তার বাড় বাড়ন্ত হবে?

স্কেচ : চিত্ত সরকার

স্মৃতি তুমি

কৃষ্ণ ধর

স্মৃতি তুমি বিপন্ন মুহূর্ত মুঠোভরে
বসে আছো একা
তোমার বিষণ্ণ দিন মুছে যাবে ঝড়ে
হৃদয়-অলিন্দ রাখো ঢাকা।

স্মৃতি তুমি দাঁড়ে-বসা নিঃসঙ্গ ময়না
ঠোঁটে কাটো স্বপ্নের শিকল
নির্জন জ্যোৎস্নায় তার মুখ দেখা যায়
তুমি তবু আছো অবিকল।

তোমার গোপন টানে জাগে মরা স্রোত
ভাঙে বেড়া, বিস্মৃতির বাঁধ
অন্ধকার থেকে তারা হাঁক দিয়ে ডাকে
তুমি করো উজ্জ্বল আঘাত॥

ছায়া ও বিচ্ছিন্ন অংশের সঙ্গে

দাউদ হায়দার

কাল সারারাত আমার কোন ঘুম হয়নি। দিগন্ত বিস্তৃত মাঠে
নিষ্পত্র গাছ যেমন একা এবং অসহায় দাঁড়িয়ে থাকে; প্রবল
হাওয়ায় আন্দোলিত হয়;—কাল সারারাত ঠিক তেমনি
আমি অনিদ্রার প্রহারে দুলছিলাম।

এইভাবে বহুরাত আমাকে জেগে থাকতে হয়। আমার ঘরময়
তখন বেহালার করুণ ক্রন্দনের মতো একটি অসুখী নিঃশ্বাস ক্রমাগত
বাজছিল।—যেন বহুদূর থেকে কোন রোদনধ্বনি ভেসে আসছে।

—আমি সেই রোদনধ্বনির ভিতরে আমারই একটি অংশকে ; গতদিনের
রচিত কোন অসমাপ্ত কবিতার শেষ পংক্তির মতো
যন্ত্রণায় বিভাজিত হতে দেখছিলাম !

"তোমার প্রেম ছিল বাবুইপাখির বাসার মতো
ঘনবদ্ধ ও শৈল্পিক"—যেন কেউ বলে গেল, আর ঠিক তক্ষুনি
ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয় আমারই আরেকটি বিচ্ছিন্ন অংশ !

সারারাত এই ভাবে আমি ছায়া ও বিচ্ছিন্ন অংশের সঙ্গে খেলতে
খেলতে নিজেকে আবিষ্কার করি : আমার ভিতরে কেউ আমারই মতো
একজন অবিরল ধারায় কাঁদছেন।

বাস্তুহীন

রত্নেশ্বর হাজরা

ছোট্ট বাসাও তার নিয়েছে শত্তুরে
সেখানে এখন সাপ ঘোরে
সাপের পিছনে ঘোরে বিষ
তার পিছে বিখ্যাত সাপুড়ে।

আগাছা করেছে গ্রাস ভিটের সীমানা
ঝোপের উপরে থার দোল
কখনো চড়ুই
ওখানে এখন যেতে মানা

পারলে বাসার কথা ভোল্
ফিরে যা, বাবুই—

হরিদাসের গুপ্তকথা

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

দুঃখ আর পরিতাপে নিঃসঙ্গ কাটায় কাল হরিদাস
একা একা ঘুমে জাগরণে।
বুকের গভীরে তার অজ্ঞাতকালের দীর্ঘশ্বাস
দূর থেকে মেঘ আর বজ্র টেনে আনে।

কখনো নারীর শোকে, কখনো বা পুরুষের শোকে
সহসা সে বিচলিত,
সহসা সে নিশাকালে নৌকাডুবি দেখে।

২

সানাই বাজিয়েছিল একদিন হরিদাস স্বপ্নের ভিতরে,
বাঁ পাশে ঘুমিয়ে ছিল রাতের নর্তকী এক নারী।
'সানাই বাজায় কে রে?' সে হঠাৎ জেগে প্রশ্ন করে;
'সানাইয়ের শব্দে কেন কাঁপে ঘরবাড়ি?'

সহসা স্বপ্নের ভুলে গূঢ় কথা জানাজানি হয়ে গেল বলে
হরিদাস ভয় পায়, হরিদাস ভয়ে ভয়ে বলে,
'একথা দিনের বেলা কোথাও করো না কানাকানি।'

'সানাই ভিতরে বাজলে অলৌকিক কাণ্ডটাও হয়।
মৃত গাছ বেঁচে ওঠে, মৃত মাছ খেলা করে জলের গভীরে,
মৃত স্বপ্নে ফিরে আসে বাদুর বিস্ময়।'

'বলে কি পোড়ারমুখো ? আ মরণ !' বলে নারী
পাশ ফিরে ঘুমোয় অঘোরে।

সানাই লুকিয়ে ফেলে হরিদাস রাতের তিমিরে,
সানাই লুকিয়ে ফেলে মধ্যরাতে সে নিশ্চিত হয়।

৩

রাত যায়, এভাবেই, নিদ্রাহীন রাত চলে যায়।
স্বপ্নের ভিতরে কাঁদে হরিদাস, ডুকরে ডুকরে কাঁদে।
কুকুরের মতো তার জ্যোৎস্নারাতে ভারি কান্না পায়।

সে কান্না থামানো যায় না ক্যানেস্তারা পিটিয়ে পিটিয়ে,
সে কান্না যখন হাহাকার
স্বপ্ন হত্যা হয়ে যায়, ঘোর ঘোর হত্যার সংবাদে
মুহুর্মুহু চতুর্দিকে নামে অন্ধকার।

এক টুকরো জ্যোৎস্নাকে নিয়ে হরিদাস কাঁদে।

জ্ঞানে, প্রজ্ঞানে

উজ্জ্বল সিংহ

পরিণত বোধবুদ্ধি নিয়ে আমি উপনীত হলাম যৌবনে
যৌবনের দেবতা আমাকে দিলেন বিচারশক্তির নিপুণ দংষ্ট্রা
তাঁর অনুগ্রহে আমি কেটে ফেলতে পারলাম নির্ভুল ফাঁস
যা আমাকে জড়ায় উন্মার্গে, অসৎ প্রোৎসাহে।
ক্রূর দূরদর্শিতা থেকে আমি এখন সঠিক সিদ্ধান্ত অভিমুখী
এখন ইচ্ছে করলেই আমি জল ও শাবানের মায়া কাটিয়ে
ফিরে যেতে পারি স্বকীয় আবহে, এখন অনুতপ্ত হই না ভুলেও

P29401

স্বাভাবিক অন্তরসমূহে, আমার পরবর্তী জীবনকালের কথা ভাবতে
মজা লাগে, আর উপবাসের সময় আমি আবিষ্ট হয়ে পড়ি
অর্থকরী চিন্তার ওমে, দেবতার দেহের বিবাদে।
অন্যে না ভালোবাসলেও এখন অন্যকে ভালোবাসতে শিখে গেছি আমি,
উচ্ছৃংখল হয়ে উঠতে গিয়ে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছি সারল্যে ও সততায়,
ভুলে যাচ্ছি ছলনা, কেউ আসবে না জেনেও কারুর জন্যে
সারাজীবন প্রতীক্ষা করতে হবে ভেবে জেগে থাকি স্বগত উল্লাসে,
হর্ষ জাগে, জাগে নিবিড় রোমাঞ্চ, আমি অবহেলা করেছি গাম্ভীর্যকে,
এই দেখুন দেবতা, কিরকম লঘুছন্দে নেচে উঠছি উদ্দাম
আপনি তো আমারই ঔরসজাত, দেখুন।
নিশ্চিন্ত মৃত্যুর জন্যেও জড়ো করে রেখেছি আমার অভিবাদন।

ঘুম

ঈশ্বর ত্রিপাঠী

বোগেনভেলিয়া ছাখো অই
অর্ধেক লুটিয়ে থাকে মাটিময় ঘাসে
অর্ধেক দুরন্ত তেজে আকাশের দিকে।

আমরাও অর্ধাংশ বলে—
রুখে ওঠো, ফুঁসে ওঠো, ঘর দোর ভাঙো
অপরাংশ তখনই চুপি চুপি প্রেয়সীর মত
চুলে ও কপালে ঢেলে মেয়েলি করুণা
বলে খুব নীচুস্বরে, 'কি লাভ, কি লাভ।'
'ঘুমাও, ঘুমিয়ে থাকো, ঘুমের মধ্যেই বড়ো হও।'
বোগেনভেলিয়া ছাখো অই
মুহূর্তও জেগে নেই
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে রোদ জল ও বাতাস পান করে
আলোর আঁধারে
বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও মগ্ন নিশ্ছিদ্র ঘুমের প্রেমে, ঘুমে।

দর্শক

গোবিন্দ ভট্টাচার্য

এ জানালা থেকে ও জানালায় গেলে
দৃশ্য পুরো বদলে যায়।

এখান থেকে আকাশ সোজা
ঝাঁপিয়ে পড়েছে জলে
ঝাঁপিয়ে পড়েছে গ্রীষ্মের পিপাসা।

ওখান থেকে বলিষ্ঠ দেবদারুর ছায়া
অসম্ভব কাঁপছে আর ভেঙে যাচ্ছে
ঢেউয়ে ঢেউয়ে সরে যাচ্ছে সূর্যোদয়।

একই দৃশ্য বারবার নতুন করে দেখতে
কখনো এ জানলা কখনো ও জানলা থেকে
আমরা মুখ বাড়াচ্ছি।

প্রতীক্ষায় দীর্ঘায়ু হাত

কাশীনাথদাস চাকলাদার

তোমার জন্যই প্রতীক্ষায় দীর্ঘায়ু হাত
বাড়িয়ে সেই সকাল থেকে আমি এই
আশ্চর্য সরল বারান্দায়
আমার স্বপ্নের সবুজ পরবাসীর
শিশুর মতো সবুজ ঠোঁটে একটি নিবিড়তম
চুমুর জন্যই সমাধি হতে বারবার
আমার উঠে আসা
শুধু তোমার ঘরের চৌকাঠেই
আমার চিরদিনের ঠিকানা শুধু তোমার
জন্যই প্রতীক্ষায় এই দীর্ঘায়ু হাত

অথচ পরবাসী তুমি সাড়া দাও কই

আমার দিনযাপন

ধ্রুব বসু

আমার কোন স্বপ্ন নেই।
মনে করতে পারো একটা মরুভূমি—
যার কেন্দ্রবিন্দুতে টাঙানো আছে প্রকাণ্ড এক লাউডস্পীকার,
লাউডস্পীকারের নির্জলা একঘেয়ে সুরই আমার জীবন
মনে করতে পারো।

এই যে আমি
আজ সারাটা দিন মন্দার গাছের ডাল থেকে
এঁটেল নালিতে জল পড়া দেখে দিন কাটালাম,
বসন্ত এলেও আমি ঠিক এইরকমই
ঘনশ্যামল বৃক্ষপত্রের মধ্যে লাল ফড়িঙের নাচ দেখে
আপন মনে হাসবো ;
আমার এ হাসির কোন এ্যানালিসিস নেই।
আমার স্মরণেই আসে না
রাতচিতার বেড়ার ফাঁক দিয়ে কিশোরীর লুব্ধ চোখ
কখন আড়ালে আমাকে দেখে গেছে।

আমি আজ আফিস ভুলবো
কাশ ভুলবো স্টেনোগ্রাফির ক্লাশ
আমি আমার সব-ভুলে-যাওয়ার পৃথিবীতে
পুষ্পাচ্ছাদিত শিউলি গাছের মতো
আপন খুশীতে দুলবো,
আমার কোন স্বপ্ন নেই
আমি ওই বুলবুলিটার মত
নিজের জ্যোৎস্নায় বেশ ভালই আছি।

মনোয়ার কাছে আমার একটা সোনার কড়ি পাওনা ছিল।

সমুদ্রের কাছে

সুদীপ্ত বিশ্বাস

একদিন দেখে নিও
ঠিক চলে যাব···
এই ঘর দোর, আশ্রয় ফেলে
যে রকম খাঁচার পাখী উড়ে যায়।

যে বাবুই পাখীকে তুমি
ঘুম পাড়িয়ে রেখেছ বুকের গভীরে
তার শেকল কাটা দেখে তুমি দুঃখ কোরোনা।
সেও চলে যাবে,—যে রকম সমুদ্র স্ফীত হয়।
অগুণতি ঢেউ ছুটে আসে কঠিন বালিতে।

একদিন দেখে নিও, আমি থাকবনা
সূর্য উঠবে—
তুমি ভালবাসার গান শুনতে
ছুটে যাবে সমুদ্রের কাছে।

নিজের মতো ক'রে

দেবব্রত দাশ

তেইশ বসন্ত শেষে কোন এক বিষণ্ণ সকালে
পৃথিবীকে মনে হ'ল ভীষণ পুরোন,
তেলচটা জীর্ণদীন বিবর্ণ ছবির মতন।
মনে হ'ল—সব কিছু অর্থহীন,
নিজের অস্তিত্বটুকু অসহায় গুরুভার।

আসলে, এ তোমার ক্ষণিক বিভ্রান্তি শুধু
ক্ষণিক ঘোরারি।

জেগে ওঠো নতুন আলোয়,
মুছে ফেলো ধুলোজমা কাঁচ।
নরম রেটিনা থেকে ঘষে ঘষে তুলে ফেলো
দুর্বিনীত অতীতের সবগুলো কিম্ভূত আঁচড়,
ফুটিয়ে তোলো চোখসহা নরম আলোয় মসৃণ নরম ছবি।

অন্যজীবন

শংকরজ্যোতি দেব

এ জীবনের বদলে কিছু ছোট ছোট জীবনের দুঃখ জড়িয়ে আমাকে
এই জীবনের অবেলায়
এ জীবনের বদলে অন্য জীবন জুড়ে লুকিয়ে থাকে
লক্ষ্যহারা পাখীর ডানার মেলা
অন্যজীবন এ কোন জীবন ? নাভির ভেতর হরিবোল শুনে শুনে
হাড়ের আরামে যে স্বপ্ন নিঃঝুমপারের আনন্দে তুলে দেয় হাত
চিতার শেষ ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় সিক্তকাঠের বদলে কুড়িয়ে পাখীর ঠোঁট
অথবা ঠোঁটের বদলে পালক
পালকের বদলে বৃক্ষহারা হৃদয়ের আর্তনাদ
এ জীবনের বদলে কিছু ছোট ছোট জীবনের দুঃখ জড়িয়ে আমাকে
এই জীবনের অবেলায়
এ জীবনের বদলে অন্য জীবন জুড়ে...

কয়েকটি সিরিয়াস ছড়া

প্রণব পাল

১

শক্তি-সুনীল বলতে পারে—চুপ !
যদি বলেন,
কালির ভেতর জল ঢেলে দাও
পেনের মধ্যে নিরোধ লাগাও
খাতার ওপর আটকে দাও ল্যাপ।
শক্তি-সুনীল বলতে পারে—চুপ !
পাথরের ডিম কোন দিন বাচ্চা দেবে না-হে
পাথরের ডিম কোন দিন বাচ্চা দেবেনা !
কবি-কবি ভাব কবিত্বের অভাব
তবুও তাদের হাতে
বেড়ে ওঠে হিজি-বিজি কাগজের স্তূপ।

২

সাবাস সাবাস !
কাগজের ফুল দেবে গোলাপের বাস।
সবাই নিজেকে ভাবে তুরুপের তাস।

৩

ওঁরা ক্লাসিক বলে নাচাম যখন
শিল্প এবং সৃষ্টি
নিশ্চিত মনে হয়
চন্দনের বনে হয় মদের বৃষ্টি।

একটু আগুন হও

চিন্ময় দত্ত

একটু চালাক হওয়া ভাল
এবং আরো ভাল
যদি একটু বুদ্ধিমান হতে পার।

ফাঁদ পেতে তোমাকে ওরা
প্রতিদিন ধরবার চেষ্টা করছে।
নানা লোভ দেখাচ্ছে,
যাতে তুমি ভ্রষ্ট মানুষের দলে যোগ দাও,
নষ্ট করে দিতে পারো জীবন,
পাপে ডুব দাও—
রঙিন টোপর পরা স্বৈরিণী সমাজ হাতছানি দিচ্ছে প্রতিদিন।
প্রতিদিন তোমাকে ডাকছে।

তুমি কি বুক জুড়ে ক্ষত চাও ?
না যারা প্রতিদিন বিষাক্ত করছে হাওয়া
মানুষের বুক, সৌন্দর্য্য—

তাদের বিনষ্ট করবে ?
একটু আগুন হয়ে ঘুরবে তাদের ভিতর ?
বড়ো অবেলায়
তোমাকে একথা বলছি,
একটু চালাক হওয়া ভাল
এবং আরো ভাল
যদি ওদের বিরুদ্ধে একটু লড়াই করতে পারো
আগুন হয়ে।

উত্তরায়ণ

শশাঙ্ক হাইত

পৃথিবীর স্বাভাবিক উদ্ভিদ পাখি
আকাশ বাতাস জল সামনের বিশ ত্রিশ চল্লিশ বছর
মাত্র দেখার ভাগ্য যে হবে
আমাদের, তারপর
চোরাশিকারীর হাতে সবকেই একে একে যেতে হবে,
নারী-অনুভব নিয়ে সেদিন আমাকে
আর তুমি ডাকবে না, আমিও তোমাকে।
কি রকম লাগে বলো ভাবলে, আজকের কোন কিছু নেই
তখন যে, পালটিয়ে গেছে পরিপার্শ্বের চেহারা,
আমাদের সন্তানের সন্তানের সন্তানের তীক্ষ্ণধার বুদ্ধির সন্তান
ঘর-গৃহস্থালি করে, মাঠেঘাটে অভাবিত যন্ত্রের সাড়া
তাদের চেতনা ঘিরে থাকে,
অধুনার সু-উজ্জ্বল তীর ছেড়ে ঢেউয়ে বহুদূরে চলে গেছে মহাকাল,
অনুভবে কেউ আর ডাকেনাকো তোমাকে আমাকে।

এমনি পাঁচশো বছর পার হবে,
এমনি হাজার বছরো হবে পার,
খনি থেকে সব সোনা তোলা হয়ে গেছে,
পেট্রোলের অগাধ ভাণ্ডার
নিঃশেষিত, ক্ষয়ে গেছে আমাদেরও
অনুভবস্পন্দিত জীবনের সুখদুঃখস্বপ্নের সব সঞ্চয়,
বাংলার রাজধানী কলকাতা নয়।

বাউল

হৃষীকেশ বিশ্বাস

অবগাহনের পর পোড়া কীর্তির দিকে
চেয়ে থাকে
যেন জ্ব'লে যেতে হবে খুব তাড়াতাড়ি
অই তার ধ্যান পিপাসা ও ঘুম
আর বহুদূর থেকে যেন কী এক
গভীর গোপন ধ্বনি ফিস্ ফিস্ করে
তার কানে কানে

দগ্ধ···ছুঁয়ে থাকে একতারা—
শুরু নেই শেষ নেই থেকে থেকে
যেন সব ছিন্ন হ'য়ে আসে
হেঁট হ'য়ে থাকে মৌন কালবেলা
আর খট খটে রোদে অনিমেষ
চেয়ে থাকে
যেন এক কাঠপুতুল।

আমার মধ্যেই আমি

বীনা ভৌমিক

কে তুমি আমার মধ্যে কথা বলো সারাক্ষণ ?
শব্দ হোয়ে বেরিয়ে আসো অজস্র ধারায়—
মিথ্যে এই কথা বলা, শুধু অযোগ্য ভালোবাসা,
কত বলি—থামো তুমি।
তুমি বলো একার শত্রু নেই।
তবুও শব্দগুলো তো শত্রু ছড়ায় !
তিল তিল করে কথাগুলো তৈরী করি,
মূল্যহীন ভাষা, নিরর্থক কথার কাকলী,
বায়ু হোয়ে মিশে যাক পাতার সবুজ রং নিয়ে।
সমুদ্রের গভীরে ডুবে থাকি আমি—
তুমি, শুধু তুমি থেকে যাও, চেতনার গভীরে আমার।

প্রতীক্ষার সীমানা ছাড়িয়ে

রথীন কর

তোমাকেই ভেবে ভেবে
এলোমেলো ঝড়ের রাতে
স্বপ্ন দেখা সার হোলো।
দুষ্টু দুপুরে
মাদুর পাতা
ঘরের কোণে
খোলা চুলের গন্ধ মেখে
স্বপ্ন থেকে হেঁটে আসবে
বলেছিলে মনের মধ্যে
হাজার ঢাকঢোলের ভূমিকম্পে,

বেলা গেলো,
প্রতীক্ষার শেষ ট্রেন
ঝমঝমিয়ে—
ভালবাসার ইষ্টিশান
পেরিয়ে গেলো
তবু তুমিতো এলে না।

এ সময়

দেবাশিস প্রধান

একা কাটে দিন তার,
মানুষের প্রিয় দিন কাটে একা একা
উদাস নিস্পৃহ একাকীত্বে বিয়োগের পৃথিবীতে।
তারপর নাগীরোলে আত্মহনন
বন্যা সংবাদ ঝিলে হয় দিকে দিকে
মাটি আর রক্তের মধুরতা ম্লান হ'লে
গৃহতলে আঁকা হয় রক্তলেখা
মানুষখেকো আসন্ন মহাপতনের সাক্ষিরা···
রক্ত ঝরে গাছে গাছে
রক্ত পতনের শব্দে ভোর হয়
গভীর রাতে ভাঙে সুখের সংসার
নিঃস্বার্থ সাম্রাজ্য দেখে
সপত্নীর একি আজ সহানুভূতির জাল?
এ যেন যে কতকাল দুর্ভাগা অ্যাগামেননের।
মানুষের দিন কাটে রাত ভোরে, ভোর রাতে
অভিন্ন স্বীকার করে এ সময় সংশয়ের কাল···

দুঃসময়

নাসের হোসেন

স্থির গাছের মতো নেতিয়ে আসে দুঃসময়, গূঢ় আবেগ
তুমি খুঁজে ভাবো শব্দের প্রাণ, মানুষের মেধার মন্দির
লাল কাঁকড়ার মতো দুলাব্ করে ওঠে চোখের সাদা
সবকিছু তীব্র-ঘুড়ির মতো ছিন্ন ওড়ে—ভেঙে যায়—
মানুষের হিম ভালবাসাও ঝরে পড়ে বরফমালার মতো
তুমি ভাবো ছুটে আসে প্রাণহীন মানুষ
তুমি মনে মনে বুক হেঁড়ো, তুমি খুঁজে ভাবো
শহর-নিখুন, সভ্যতার আবরণ
তুমি আবরণের মধ্যে চেয়েছিলে ছুটে যেতে—
জলে পা রেখে খাড়া হতে…
কোনো কি প্রত্যাশা ছিল তাহার কাছে
নাকি ফুল-পলকেল ?
স্থির গাছের মতো নেতিয়ে থাকে দুঃসময়, গূঢ় আবেগ…

সিঁড়ি

জীবনময় দত্ত

শবের পাতালপুরী থেকে
নেপথ্য স্বরগীয় উঠে আসে
অনবরত
ক্রমশঃ অহঙ্কারী প্রতিমা স্থির হয়ে যায়
নূপুর বা নৈবেদ্য
সবই তখন প্রতীকি মনে হয়
কারণ সূর্যের বিম্ব আলোর
সন্তর্পণে শুধু সিঁড়ি ভাঙি।

তোমাকে

সুনির্মল বসু

এখন আমার ক্লান্ত সময়ে
তুমি উষ্ণ-বাতাসের মাধুরী নিয়ে
সর্বক্ষণ ভেসে আসো।
তোমার নক্‌সা-কাটা
শাড়ীর পাড়, দু'টি স্বপ্ন স্বপ্ন চোখ
তোমার গায়ের মৌ মৌ গন্ধ
মনে ভাসে। আর, এই আমি
তখন আনন্দের-সমুদ্রে ডোবা-ভাসা হই।
যখন সময়—আমার সময়
কেবলই নিরন্তর ছুটে চলে—
আর হাতে আমার কাজ
থাকে না কিছুই।
তখন একরাশ দুষ্টু বাতাসের মতো
মিষ্টি মিষ্টি হাসি, কথা মনে আসে।
তুমি যেন নিরবধি কালের
প্রেমিকা হয়ে ওঠো।
সকাল-বেলাকার কুয়াসায় যেমন
সূর্য ঢাকা থাকে—পরে দিনের আলো ছড়ায়।
তেমনি তোমরা মানসীরা
চিরকাল আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকো
আর, দিগন্ত-জোড়া আনো আলোর ভুবন॥

কিরণচন্দ্র মৈত্র-র বড় গল্প

মিলিমিটার

মামা-জামাইবাবু-বড়সাহেব-বড়বাবু-এম. এল. এ, এম. পি 'র 'রেকমেনডেশনে' বহু দরজায় ধাক্কা খেয়ে, মড়ার একমাত্র আশ্রয়স্থল শ্মশানের মত, আমারও কলকাতা করপোরেশনের লাল বাড়িতে একটা কাজ জুটে গেল। সেই বিখ্যাত-সুখ্যাত-কুখ্যাত লালবাড়ি। বিভাগীয় বড় বাবুটি একটি 'পগেরা' 'বকেরা' জাতীয় খচ্চর; আমায় 'চোরপরেশনের' গীতার মন্ত্রটি শুনিয়ে দিলেন—"চেপে কাজ করবে; কাজের পেছনে ছুটবেনা, কাজ তোমার পেছনে ছুটোছুটি করে মরবে; উপার্জন বাড়াবার সমস্ত কৌশলগুলো জেনে নাও; আমাকে যদি খুশি রাখতে পার, নিজের যাবতীয় ধান্ধা, এমনকি ভিক্টোরিয়া অথবা গঙ্গার ধারে বসে প্রেম-ট্রেমও অফিস টাইমে 'উইথ ফুল পে' করতে পারবে বা ওই সব করার জন্যে 'ওভারটাইম' পেয়ে যাবে! এটাই এখানকার ধারা, সে তুমি যারই কুটুম হওনা কেন।"

এ হেন এক নিরাপদ দুর্গে আশ্রয় পেয়ে দিব্যি চালিয়ে যেতে আর কোনই অসুবিধা নেই, এক দেবতাকে তুষ্ট রাখতে পারলেই হ'ল, তেত্রিশকোটি দেবতার দেশে। মাথাগুঁজে একমনে ফাইলের আড়ালে একখানা অতি আধুনিক ও সরেস প্রেমের উপন্যাস পড়ছি; কানে এলো, "ওহে পটলবাবু (খচ্চরটা আমার ডাক নামটাও জেনে নিয়েছে), তোমার বোধহয় গঙ্গা পাড়ের ডাক এসেছে তারা।" ঘাড় তুলে বড়বাবুর প্রতি তাকালাম। টেলিফোন রিসিভার দেখিয়ে বললেন, 'নাও ধর।'

—হ্যালো, পটলা?

—আপনি কে বলছেন?

—আমাকে চিনতে পারলি না? আমি মিলি? তুই পটলা না?

—আপনাকে চিনলাম না, অথচ আপনি আমার ডাক নামটাও···

বড়বাবুর গলা—তারা একটু সামলে চলবে, মনে হচ্ছে গঙ্গাপাড়ের কেস নয়, নিউ মার্কেট-পার্ক স্ট্রীট কেস।

—আমার গলার স্বরও চিনতে পারছিস না হাঁদারাম। আমি চামেলি।

—তাই বল, তুই ত 'চার্মি' ছিলি 'মিলি' হলি কবে থেকে? কোনে এই প্রথম তোর গলা শুনলাম, কি করে চিনব বল। তোর খবর কি? কবে এলি কোলকাতায়?

বড়বাবুর মন্তব্য—না, আমার স্পেকুলেশন দেখছি ভুল। ভায়া ঠিক ভিক্টোরিয়া গঙ্গার পাড়ে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। 'তুই'-রস শুনেছি খুব ঘন রস এবং গ্যাজান রসও বটে।

—অনেক কথা আছে। ছুটির পর তার আশুতোষের স্ট্যাচুর সামনে অপেক্ষা করিস আমি যতক্ষণ না আসি।

—মেয়েটি কে? বড়বাবুর গম্ভীর প্রশ্ন।

—আমার দেশের, এক পাড়ার বাড়ি; ছোটবেলা থেকে···

—অনেকদিনের গ্যাজান রস; এখানেও এক পাড়ার সমাবেশ। উপদেশ নিষ্প্রয়োজন। তবে ভায়া পুকুর আর সমুদ্দুর এক নয়।

একে চামেলির ডাকে তেমন সাড়া পাচ্ছিনা; বড়বাবুর মন্তব্যে মেজাজটা খিঁচিয়ে উঠল। বললাম, আপনি সকলকেই এক লাইনের ভাবেন। আমরা ভাই-বোনের মত।

—কি করবো ভায়া। এই হাত দিয়ে অনেক ফোন ধরেছি; সব লাইনই শেষ পর্যন্ত রোমে গিয়ে পৌঁছায়; সোজা পথে, না হয় ঘোরা পথে। একমাত্র মায়ের পেটের বোন ছাড়া সব 'তুত' বোনই শেষ পর্যন্ত তুতু করে ডাকে আর ছেলেরা কুঁ কুঁ করে ল্যাজের মত মাথার চুল খাড়া করে ছুট দেয়।

চামেলি ও আমি কলকাতা থেকে শ দুয়েক কিলোমিটার দূরে এক মফঃস্বল শহরের অধিবাসী। ওরা পাঁচ পুরুষ ধরে; আমি দেশ ভাগের নৈবেদ্য। চামেলি দেখতে ছিল যেমন ধাঁড়ি, স্বভাব ছিল তেমনই জংলী। শরৎ-হেমন্তেই ওর দেহে বসন্তের কুঁড়ি ফুটতে সুরু করেছে; ওর প্রতি সোজা তাকান যায় না। বয়েসে বড় হয়েও ওর মাতব্বরীতে অস্থির আমরা। কথা নেই, বার্তা নেই একদিন ওদের বাড়ির পেছনে টেনে নিয়ে গিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরে চুমো খেতে সুরু করল। তখন আমি ছাপপ্যান্ট পরলেও আমার দাড়ি-গোঁফের আভায় কলনের প্রতিশ্রুতি ফুটে বেরিয়েছে।

—নে এবার তুই আমাকে খা।···তুই একটা সবেট, পরেশদা কেমন স্মার্ট। ও বয়েসে নাকি ওসব একটু আধটু হয়, বিশেষ করে যাদের বয়েস আন্দাজে বাড়ন্ত শরীর। চার্মিকে সমীহ করার আর একটা কারণ ছিল। মিশনারী স্কুলে

পড়া-মেয়ে ইংরেজীর খৈ ফুটিয়ে আমাদের ঘাবড়ে দিত। আমাদের কেরানী বিদ্যের দৌড় দু'চার লাইন পড়া বা লেখা ; বলা নৈব চ। চামেলি ছোটবেলা থেকেই দারিদ্রকে ঘৃণা করত এবং সব সময়ে বলত—তোরা দেখে রাখিস, যদি বাঁচি ত বাঁচার মত বাঁচবো, খুচরো পয়সা গুণে জীবনটা নিঃশেষ করবো না। আমরা বলতাম, বেশ ত ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার হবি।

বি. এ. প্রাশ করে আমি কলকাতায় চলে এলাম বৃহত্তর জীবনের পাশপোর্ট সংগ্রহ করতে। মেয়েদের কলেজে তখনও ডিগ্রি ক্লাস খোলেনি। চামেলি আই-এ পাশ করে, ঘরে বসে খেয়ে ঘুমিয়ে পাকা তরমুজটি হয়ে উঠেছে ; বিয়ের হাটে সময়মত বিকোতে না পারলে গলে পচে রস গড়াতে সুরু করবে। আমিই ওকে যুক্তি দিয়েছিলাম—বসে খেয়ে খোদার খাসী না হয়ে টাইপটা অন্তত শিখে রাখ, ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে। আমায় খানিক খিঁচি করল, বি. এ. পাশ করেছ হাঁদারাম জাননা মেয়েদের খাসী করা যায় না ; ওটা তোমাদের এক-চেটিয়া ; আমরা শুধু খাসীর মাংস খাব ! টাইপ-এ অবিশ্যি ভর্তি হয়েছিল।

চামেলি যখন এলো তখন প্রায় সাতটা বাজে। আমার পঁচিশ পয়সার বাদাম ইতিমধ্যে হজম হয়ে গেছে এবং তলপেট-কোমর-হাঁটু-গোড়ালি ও মেজাজ টনটন করছে। ও কিন্তু নির্বিকার !

—অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছিস ; খুব খিদেও পেয়েছে ; চ কোথাও বসে কিছু খাওয়া যাক।

একটু স্লিম হওয়াতে দেখতে বেশ সুন্দরী হয়েছে। সাজগোজে অতি আধুনিক কোলকাতাই ছাঁট। ব্লাউজ বানিয়ে দর্জি খুশি হ'লেও ছিটের টুকরো-টুকু বিক্রি করে দোকানদার মোটেই খুশি হয়নি।

—অফিসের পর বৌবাজারে যাই টেলেক্স অপারেশন শিখতে ; তাই দেরি হ'ল।

—তুই কলকাতায় এলিই বা কবে ? কোথায় চাকরি করিস ? আছিসই বা কোথায় ?

—বাড়িতে বেকার বসে থাকতে বোকা বোকা লাগছিল ; যে কটা ছেলে বিয়ের সম্পর্ক করতে এলো, সবকটা হাঁদারাম ; আর আয় তিন অঙ্কের নিম্ন স্তরে। ঠিক করলাম ক'লকাতায় এসে চাকরি করবো। একটা সুযোগ জুটেও গেল।

—কি রকম সুযোগ ?

—দিদি জামাইবাবু আমাদের ওখানে কদিনের ছুটি কাটাতে গেছল।

—তোর আবার দিদি-জামাইবাবু কোথ্‌থেকে এলো ?

—আমার পিসির ভাসুরের জামাই। জামাইবাবুটি এখানে একটা বড় কোম্পানীর 'মেটেরিয়েল ম্যানেজার'। জামাইবাবুর মধ্যে একটু দুর্বলতা ইনজেকশন করে দিলাম ; তারপর ধরে বললাম চাকরিং দেহি···। পনের দিনের মধ্যে চাকরি জুটে গেল ! ওদেরই এক গুজরাটি সাপ্লায়ারে'র অফিসে ; টাইপিষ্ট কাম-পিএ ; আড়াইশ টাকা মাইনে। দেড়শ টাকার বেশী কাউকে দেয়না ; আমার জন্যে স্পেশাল গ্রেড ! সাতটার জায়গায় পাঁচটায় ছেড়ে দিচ্ছে। আর, আর গায়ে টায়ে হাত দিতে সাহস পায় না ; রাবণের মত ঠিক করেছে, সীতার মন জয় না করে ইয়ে করবে না।

—এখানে আছিস কোথায় ?

এখন অবধি ওই দিদি-জামাইবাবুর ওখানে। আর তাতেই সমস্যা বেধেছে। দুর্বলতার ইনজেকশনের ডোজটা একটু 'হেভী' হয়ে গেছল বুঝলি ; তাই জামাই-বাবুটি তার বাড়িতে আমায় পেয়ে একটু বাড়াবাড়ি সুরু করেছে। 'মিলি' নামে ডাকা মাত্র দিদিটি জামাইবাবুর চাইতে অনেক পর হয়ে গেছে ও পাকে প্রকারান্তরে বাড়ি ছাড়ার নোটিশ দিচ্ছে। জামাইবাবুকে ম্যানেজ করা যেত, কিন্তু দিদি যখন একবার বিগড়েছে, একেবারে কুরুক্ষেত্র করে ছাড়বে—Suspicion thy name is woman !

—জামাইবাবু বাইরে বাইরে ম্যানেজ করে দিদিটির কাছে ভিজে বেড়ালটি হয়ে থাকলেই পারত।

—স্বামীর মুখে মদের গন্ধ আর গায়ে অন্য মেয়ের ছোঁয়া মেয়েরা এক মাইল দূরে থেকে ধরতে পারে। তাছাড়া জামাইবাবুটির ঘটি ভরে জল তুলে মাথায় ঢেলে খুশি নন, পুকুরে নেমে একেবারে ডুব সাঁতার কাটতে চান।

—জামাইবাবুকে ছাড়লে জামাইবাবুর দেয়া চাকরিটি ধরে রাখতে পারবে ?

—সে তোকে ভাবতে হবে না। শোন, তোকে যে জন্যে ডেকেছি ; আমাকে একটা লেডিজ-মেস কিংবা হোষ্টেল ঠিক করে দে। পেইং গেষ্ট হয়েও থাকতে পারি।

—ও ধরনের কোন জায়গা আমার জানা নেই ; তবে চেষ্টা করবো। কিন্তু জামাইবাবুর চাকরিটি গেলে পেইং হবেটা কোথ্‌থেকে ?

—চাকরি গেলেই হ'ল। চাকরির মালিক একজন পুরুষ না ! একেবারে বক-

ধার্মিক ; কেমন জুলজুল করে তাকায়। আমি ইচ্ছে করে মাঝে মাঝে এমন পোজ দিই……।

—এসব'ত শুনি আধুনিক গল্পে পাওয়া যায়।

—আধুনিক গল্প'ত বাস্তবের ফোটোগ্রাফ। ওদের লোভের প্রাসাদে চড়েই আমাকে বাঁচতে হবে। জানিস, আমার মালিক একদিন আমায় লান্চ খাওয়াতে নিয়ে গেছল। খেতে খেতে আমায় কী বলল জানিস ?

বলল, 'মিস মিটার আপনার ম'ত একজন বিউটিফুল লেডি কেন আমার ছোট্ট অফিসে পড়ে আছেন ; আপনি বেশ ইংরাজী জানেন, টাইপ জানেন ; আমি একটা বড় কোম্পানীতে আপনার চাকরি করে দেব, আমার ফ্রেণ্ড সেখানে দুই নম্বর কর্তা। তবে আমার সাথে ফ্রেণ্ডশিপ রাখতে হবে কিন্তু।'

—মানে ওর সাথে কষ্টি নষ্টি করতে হবে এই ত ? বড় কোম্পানীর কাজটা পাওয়ার পর দিদির হোটেল ছাড়লে ভাল হ'ত না কি ?

—তুই সবসময়ে সীমা ছাড়িয়ে যাস। বড় কোম্পানীর নাম জেনে সব খবর নেয়া হয়ে গেছে ; টোপও ফেলেছি। ওদের টেলেকস অপারেটর মাসখানেকের মধ্যে মেটারনিটি লিভ নিচ্ছে ; খুব সম্ভবত আর জয়েন করবে না ; সেই জন্যই তড়িঘড়ি করে টেলেকস শিখছি। যদি চাকরিটা লাগাতে পারি ; পরবর্ত্তী ধাপে শর্টহ্যাণ্ড শেখা—একেবারে পিএ অথবা সেক্রেটারী ! কিরে, পারবি একটা হোটেল বা মেস ঠিক করে দিতে ?

—পারব কিনা জানিনা; তবে চেষ্টা করব।

—তোকে কবে ফোন করব বল ?

—ফোন করবি না ; বড়বাবুর টেবিলে ফোন ; তোর গলা শুনলেই হারামিটা যা তা মন্তব্য করবে।

—গলা শুনেই রথন… ; ওকে মজাতে বেশী সময় লাগবে না ; আলাপ করতে পারলে উপকার পাওয়া যাবে।

—আমায় দিন সাতেক সময় দে ; তুই বরং আগামী শুক্রবার এখানেই আসিস।

রূপ থাকলে রূপসী হয় ; কিন্তু রূপ থাকলেই সুন্দরী হওয়া যায় না। চামেলির মনটা কতগুলো উদ্ভট ভাবধারার জংগল হয়ে রয়েছে। ওর মত মেয়ের রসাতলে যাওয়ার উপযুক্ত স্থান এই ক'লকাতা শহর ; যেমন গরিব গেরস্তর পক্ষেও বেঁচে থাকার অতুলনীয় স্থান এই আজব শহর। চেহারাটা ইরানিং

আরো খোলতাই হয়েছে। ওকে দেখলে মনে লালসা জাগে কিন্তু ভালবাসতে ভয় হয়; একে বনফুল তায় কাঁটায় ভরা। ফুল পেলে শিশুরা যা করে ওকে দেখলে তাই করতে ইচ্ছে হয়। একে মেয়ে তায় সুপরিচিতা কাজেই বিপদে স্মরণ করেছে যখন, গরু খোঁজা করে একটা আশ্রয় ঠিক করে দিতেই হবে।

ছোট বেলা থেকে চামেলি মধ্যবিত্তের বিত্তলোভে ভুগছে। বড় বড় জিনিস কল্পনা করতে ভালবাসে—গাড়ি-বাড়ি-শাড়ি; বড় লোকের যাবতীয় ঠাট-বাট; অনেক টাকা; খুশিমত খরচ কর মুঠো মুঠো; বাঁচার মত বাঁচা ইত্যাদি। অবশ্য বড় বড় কল্পনা একটা বয়েসে সবাই করে; ওটা না থাকলে মানুষ বাঁচবে কেমন করে? যদিও সে কল্পনা রূঢ় বাস্তবের সংঘাতে ভেঙে তছনছ হয়ে যায়; সাগর সৈকতের বালুর সৌধগুলো ঘোলা জলের ঢেউ মুছে নিয়ে যায়, কিন্তু আবার সৌধ গড়ে ওঠে। এই ত আমি! ভেবেছিলাম ডাক্তার হব; হলাম করপোরেশনে'র স্বাস্থ্য বিভাগের কনিষ্ঠ কেরানী। তবু কি জীবন সম্পর্কে কল্পনা ছাড়তে পেরেছি! এই মুহূর্তে··· !! চামেলির রূপ আছে, সাথে লোভ আছে; কাজেই ওর বিপদ পদে পদে। এটা হচ্ছে নারী-মাংস-লোভী-পুরুষ প্রধান যুগ। ওরও চটপট একটা বিয়ে করে ফেলা উচিত।

অফিস থেকে বেরিয়ে সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে স্যার আশুতোষের মূর্তির নীচে এসে দাঁড়ালাম। জানি চামেলি এত তাড়াতাড়ি আসবে না। তবু আমার যেন তর সইছিল না। হালদারদার চেষ্টায় বালিগঞ্জের বেলাভূমিতে কাজ-করা মেয়েদের একটা হোষ্টেল পাওয়া গেছে। এক খ্রীষ্টান পরিবারে পেইং গেষ্ট হিসাবেও থাকতে পারে। তবে সেটা চামেলির পোষাবে না। জল খরচ থেকে রাত্রে বাড়ি ফেরা অবদি প্রতি পদে 'রেষ্ট্রিক্শন'। মেসটাতে সিট এবং একা থাকার ঘর দুই রকম ব্যবস্থাই আছে। তবে মেস মেসই; আমি নিজেও মেস-এ থাকি। ঘরের চারদিকে খাটিয়া মাঝখানে ম্যানহোলের মুখ। দিনে মাছ ভাত, তবে ঝোলে নেমে মাছ খুঁজতে হয়। রাতে ডাল রুটি; জলের তোড়ে ডাল ডালত্ব হারাতে বসেছে। সকাল অথবা বিকালে টিফিন। সে টিফিন ব্যাখ্যা না করাই ভাল। একশ পঞ্চাশে এর বেশী হয়ও না। তারকা খচিত হোটেলের নীচ দিয়ে নিয়মিত যাতায়াত করার ভাগ্য নিয়েই বা আমার মত কজন জন্মেছে।

দুজনের টাকায় একটা ছোট্ট সংসার···। আপত্তির কী থাকতে পারে।

চামেলি পি-এ না হওয়া এবং আমার 'ল'টা পাশ না করা অবধি ছেলে-মেয়ে না হলেই···। ভিখিরি ছেলেটা হোঁ মেরে মেরে কুড়িয়ে নিচ্ছে। তার মানে আমি গোটা বাদাম ছুঁড়তে সুরু করেছি। চামেলিকে জড়িয়ে জীবন-সৌধ কল্পনা—মাটির বাসনয়ালার কল্পনার পরিণতি।

সব শুনে চামেলি বলল, 'শোন পটলা, ওসব পেইং গেষ্ট-ফেষ্ট থাকতে পারব না; চল্লিশ লিটার জল আমার বাথরুম করতেই লেগে যাবে; চান ত দূরের কথা, মাথাও ভিজবে না। তুই আমার জন্যে হোষ্টেলে ব্যবস্থা কর; সিংগিল-বেড্ রুম চাই। মেয়েরা এক ঘরে থাকলে বড় অসভ্যতা করে; ছুটির দিন শুয়ে শুয়ে পরের নিন্দা আর সিনেমার নায়কদের নিয়ে খিস্তি; ওসব আমার সহ্য হয়না।

—মাইনা ত পাস আড়াইশ টাকা, চালাবি কী করে?

—কেন, ঘাটতি যা পড়বে তুই দিবি। দিবিনা বল? চামেলি আমার গালটা টিপে দিল; ওর স্বভাবই এই রকম।

—আমার যে কি মুরোদ সেত তুই ভাল করেই জানিস। তবে একটা কথা, দুজনে এক সাথে থাকলে···। ওর গাল টেপা আমায় প্রশ্রয় দিল।

—প্রবোধ সান্যালের নায়ক নায়িকার মত একসাথে থাকতে চাস বুঝি? আমাদের বয়েসী দুজন ছেলে-মেয়ের একসাথে থাকার ঝুঁকি অনেক। তোকেই বেশী বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। তাছাড়া কোন বাড়িওয়ালা আমাদের ভাড়া দেবেনা।

—কেন, ঝুঁকি বিপদ এড়িয়েও ত একসাথে থাকা যায়।

—তোর বক্তব্য আমার মগজে ঠিক ঢুকছে না।

—এই ধরনা, দুজনে বিয়ে থা করে···; ছোট্ট একটা ফ্ল্যাট। সুন্দর সংসার···।

—পটলা, তুই যে কি করে এতদূর ভাবতে পারলি আমি সেটাই বুঝতে পারছিনা। তোকে খুব ভালবাসি ঠিকই; কিন্তু তোকে বিয়ে করতে আমি ক'লকাতায় আসিনি। ছোট বেলার বন্ধু হলেও তুই যে তলে তলে এতদূর এগিয়েছিস তা আমি কল্পনাও করিনি। একটু আধটু কষ্টি-নষ্টি আলাদা কথা, কিন্তু বিয়ে···

—তুই বিশ্বাস কর চামেলি, এখানে আসার আগের মুহূর্তেও আমি এসব কথা ভাবিনি। এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হঠাৎ একটা কঠিন অঙ্ক মিলিয়ে ফেললাম।

—জীবনটা এমন সহজ অঙ্ক না রে যে বাদাম চিবুতে চিবুতে মিলিয়ে ফেলা যায়।

—কেন, আমরা বিয়ে থা করে সংসার ফাঁদলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হবে?

—তুই কি আজও বুঝতে পারলি না যে তোর মত একজনকে বিয়ে করে গলায় ঝুলাবার জন্যে আমি জন্মাইনি। আমাকে তুই ছোটবেলা থেকে দেখছিস।

—সেই জন্যেই ত প্রেম-ভালবাসার পর্ব ডিঙিয়ে এত সহজে বিয়ের প্রস্তাব করলাম।

—তুই আমাকেই শুধু চিনিসনি না, তুই নিজেকেও চিনিসনা। আমার জীবনের স্বপ্ন অনেক বড়। একজন কেরানীর বউ, গোটাকয়েক অর্ধভুক্ত, অর্ধনগ্ন ছেলেমেয়ের মা, অভাব অনটনে ভরা সংসার, বছরে একটা সিনেমা, মাসে একটা সস্তা সিনেমার বই, অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, এ্যানিমিয়া বিকোলাই, আর বিছানায় নরমাংসের খেয়োখেয়ি। What a hell of a life! এর চাইতে গঙ্গায় ডুবে মরার চার্ম অনেক বেশী।

—সাধারণ ঘরের মেয়ে তুই; আমিও দেখবো বিয়ের হাটে তুই কতয় বিকোস।

—Well, I may change! তবে হিমালয় চূড়ায় আরোহণ করা যার উদ্দেশ্য, সে কখন সাঁওতাল পরগণার ছোটো পাহাড় থেকে যাত্রা সুরু করেনা। দেখবি আমার স্বপ্নের ফসল আমি তুলবই।

—একে মেয়ে, তায় রূপ আছে তাই বড় বড় কথা বলতে পারিস।

—তুইও যদি সে রকম পুরুষ হোস এবং তোর মগজের জোর থাকে তবে তুইও উই ঢিপি হয়ে থাকবি না। তোমরা মগজের জোরে কতরকম ছেনালি-পনা করে আসছ; আমরা রূপের জোরে কিছু করলেই, সব গেল গেল কেন? It hardly makes any differnce।

—যাক, বাজে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। এই ঠিকানা দিলাম; নিজে গিয়ে 'এ্যাড্‌ভান্স' দিয়ে সাতদিনের মধ্যে ব্যবস্থা পাকা করে এস। কিন্তু টাকা দিবি কোত্থেকে, এখনও ত রাজরাণী হোসনি?

—ভয় নেই, তোকে দিতে হবেনা। বরং প্রয়োজনে জানাস, আমিই তোকে দেব।

—তোর সাথে সম্পর্ক রাখার শেষ বাসনাটুকুও বোধহয় শেষ হয়ে গেল। তোর ভবিষ্যৎ আমি দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

—এসব তোর রাগের কথা পটলা। আমরা ছোটবেলা থেকে বন্ধু; চিরকাল বন্ধুই থাকবো। জানিস, এই সামান্য সময়ের মধ্যে আমি বুঝে নিয়েছি, এই শহরে বহু পুরুষপুঙ্গব আছে যাদের দুঘণ্টা খেলাতে পারলে বাকি বাইশ ঘণ্টা নবাবী চালে বাঁচার গ্যারান্টি পাওয়া যায়। তুই ত নেহাতই একটা ব্যাঙাচি!

—চামেলি! গলা দিয়ে রাগটা কেটে পড়ল।

—রাগ করিসনা ছোটছেলের মত। ঠাট্টা বুঝতে শেখ; এই শহরে বাঁচতে যদি চাস জীবনটাকেই ঠাট্টা বলে মেনে নে। চল আজ ওঠা যাক্। হোটেলে সিক্‌ট করার পর দুজনে একদিন মোগাম্বতে তন্দুরী চিকেন খাবো। তোর দৌড়'ত ফুটপাতের ছোলা-মটর-কলসির চা আর বড়জোর সিঙ্গাড়া-কচুরি।

—কঠোর সত্য বলা উচিত নয়। মানুষকে আঘাত দেবার অভ্যাস আজও তোর গেলনা।

—আমি মন খোলা বন্ধুত্বে বিশ্বাস করি।

আমি ভিক্টোরিয়া মেমরিয়াল দেখিয়ে বললাম, সব কথাবার্তার নীরব সাক্ষী। চামেলি একটু হাসল। চৌরঙ্গীর দিকে হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞাসা করল, বলত ছোটবেলার বন্ধু আর বড়বেলার পরিচিত পাঁচটা ছেলের মধ্যে পার্থক্য কী?

—ছোটবেলার বন্ধুটিকে বিয়ে করা যায়না; কিন্তু অবেলার পাঁচটির শ্যালিকাটিকে বিয়ে করা চলে। রাগ ঝাড়তে পেরে খুশি হলাম।

—ছোটবেলার বন্ধুর সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে গল্প করা যায়, ঝগড়া করা যায়, রাগারাগি হাতাহাতিও চলে, এতে বন্ধুত্ব আরো গাঢ় হয়। অন্য ছেলেদের কেবল ছুকছুকানি। গা ঘেঁসে বসবে, গায়ে হাত দেবে; বুকে উঁকি মারবে, মুখে চুমু খাবে। এদিকে পুলিসের ভয় সাড়ে ষোল আনা। অগত্যা ট্যাকের জোর থাকলে ট্যাকসি কিংবা রেস্তরাঁর খুপড়ি।

—তোর অভিজ্ঞতা আছে বলে মনে হচ্ছে?

—নারে, দেখে-শুনে-পড়ে জেনেছি। তবে আমার কোন 'প্রেজুডিস' নেই। কিন্তু মানিস'ত কোকিল আর কাকের রুচি এক নয়।

চামেলি হোটেলে গেল, চিকেন খাওয়াল, নতুন কাজ জোটাল এবং সে অফিসের বড় সাহেবের পিএ হ'ল, মাস মাইনা সাড়ে সাতশ টাকা প্লাস···।

সিনেমার পর্দার অগ্রগতি। চামেলি মিত্র এখন মিস মিটার। ওর 'বস্' ওকে 'মিলি বলে। নামটা নাকি তার ভারি পছন্দ! ছোটবেলায় চামেলি একবার একটা হেলে সাপের লেজ ধরে ঘুরিয়ে মেরে ফেলেছিল। সেই থেকে ওকে দেখলেই আমার মনে একটা বিষাক্ত সাপের ছবি ভেসে ওঠে। কিন্তু যতই রাগ ঘৃণা হোক ওর কচি লাউয়ের মত ডাগর হয়ে-ওঠা শরীরটার প্রতি লোভ যে ছিল না তা নয়। চামেলি জানত অনেকেই কল্পনায় ওর দেহটা ভোগ করে। ও খেলায় কিন্তু ধরা দেয়না।

সমুদ্রে যারা গা ভাসিয়েছে গ্রামের পুকুরটার প্রতি তাদের আকর্ষণ একটু বেশী, মাঝে মাঝে সে পুকুরে পা ডুবিয়ে বসে থাকতে মন চায়। তা নইলে অফিস পাড়ার বিখ্যাত নাম মিস মিটার আমা হেন লোকের খোঁজই বা রাখবে কেন। মূল্যবান সন্ধ্যার দু'একটা আমার পেছনে বাজে খরচই বা করবে কেন! তোর কাছে এসে দু'ট সহজ কথা বলতে পেরে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। এ যেন বাইরের ড্রেস ছেড়ে স্নানের পর ঢিলেঢালা আটপৌরে সাজের আরাম! আমার অবস্থা বুঝে মাঝে মধ্যে আমার পকেটে টাকা গুঁজে দেয়। শোধ দেবার কথা বললে খিস্তি করে।

—মুস্কিল কি জানিস? তোর অভাব আমি মেটাতে পারলেও আমার যদি কখনও অভাব হয় সেটা মেটান তোর মুরোদে কুলোবে না। অবশ্য সে রকম দিন আসলে গঙ্গার এত জল খুব সহজেই আমার অভাব মিটিয়ে দিতে পারবে।

হঠাৎ একদিন চামেলি আমার অফিসে এসে হাজির। বড়বাবু উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাল। ইতিমধ্যে ফোনে তার সাথে আলাপ করে নিয়েছে। আমার মাধ্যমে ভাল ভাল ডাইরি-ক্যালেণ্ডার ভেট পাঠিয়েছে, ফোন করে বিরক্ত করে বলে। বড়বাবু এখন আর কোন বাধা নন, এমন কি আধ-ঘণ্টা ধরে ফোনালাপ করলেও কিছু মনে করে না। চামেলি আমায় দেখিয়ে বড়বাবুকে বলল, ওর ভাইফোঁটার খাওয়া পাওনা আছে, আজ সময় হয়েছে; ওকে একটু আগে ছেড়ে দিতে হবে।

—এর জন্যে কষ্ট করে নিজে আসার কোন দরকার ছিলনা; একটা ফোন করলেই…।" হারামিটা ওর আছড়ে পড়া ঢেউয়ের মত বুকের প্রতি ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে। বুড়ো ভাম! এক নম্বরের খচ্চর। আমি'ত অবাক ওর ব্যাপার স্যাপার দেখে; এ মেয়ে সব পারে।

—ও রকম হাংলার মত দেখছিস কি? সাত জন্মের ভাই আমার। 'বস'

দিল্লী গেছে। অফুরন্ত সময়; আমিও তোর এখানে চলে এলাম। একটা বিখ্যাত দোকানের বিখ্যাত মোগলাই পরটা ও কষা মাংস খেতে খেতে কথা হচ্ছিল।

—তোকে আরও ভাল জায়গায় আরও ভাল জিনিস খাওয়াতাম; কিন্তু তোর' আবার সাঁতার জানা নেই।

—কেন, সেখানে কি সাঁতরে যেতে হয়। ভেজা কাপড়ে; তুইবা···

—নানা, সে জিনিস খাওয়া মানেই হাবুডুবু খাওয়া। I mean drink!

—তুই কি ওটাও ধরেছিস না কি?

—ধরাধরির কি আছে? পার্টিতে দু'একবার খেয়েছি। জীবনটা বেশ হাল্কা মনে হয়। তবে খাওয়ার চাইতে অন্যের খাওয়া দেখতে বেশী ভাল লাগে।

—কথায় আছে হিঁদু যখন মোছলমান হয় এবেলা-ওবেলা গরু খায়। মফঃস্বলের মেয়ে অথচ রকেটের গতিতে ছুটে যাচ্ছিস ধ্বংসের মুখে। বাড়ির সাথে সম্পর্কও চুকিয়ে দিয়েছিস শুনলাম?

—বাড়ি আমার সাথে সম্পর্ক রাখতে চায় না। আমার টাকাটা চায় কিন্তু আমায় ঘেন্না করে। ভায়েরা আলাদা; যে যার বউ-সংসার নিয়ে ব্যস্ত। মাকে টাকা পাঠাই। ব্যস মিটে গেল। আমিও যেতে চাই না, ওরাও আমি যাই সেটা চায় না। আমি লক্ষ্য করলাম ওর ওজনটা একটু বেড়েছে এবং সাথে সাথে 'ভ্যালু'ও। সাজ-পোষাক আরো উঁচু দরের। জিজ্ঞাসা করলাম, বিয়েথা করবিনা; নাকি এখনও তেমন কাউকে পাকড়াতে পারিসনি?

—এক একটা আঙুলের টিপে এক একটাকে পাকড়ে রেখেছি—নিজেকে দিয়ে বুঝতে পারিসনা তোদের কদর? তবে বিয়েথা আপাতত নয়। এত বোকা আমায় ভাবলি কী করে? বিয়েই যদি করব, ছোটবেলার বন্ধু তোর মত ভাল ছেলে ছেড়ে আবার কোথায় কেষ্ট খুঁজতে যাব। সেসব পরে দেখা যাবে; এখন কটা দিন হেসে খেলে বাঁচি। তুই'ত হিন্দী সিনেমা দেখিস না, নইলে একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাতাম।

—তুই শর্টহ্যাণ্ড জানিস না, পিএ হলি কেমন করে?

—পয়সা দিয়ে সার্টিফিকেট জোগাড় করলাম; আর প্রথম দিনই বসকে গ্যাস দিলাম, 'আপনি শুনেছি দারুণ স্পিডে ইংরাজী বলেন; কিন্তু আমি'ত নতুন, দয়া করে কটাদিন একটু আস্তে ডিক্টেশন দেবেন। ব্যস, গ্যাসটি এমন ধরে গেল যে বস খুব কষ্ট করে আস্তে আস্তে ডিকটেশন দিতে লাগলেন যাতে আমি শর্টহ্যাণ্ডে লিখতে পারি। বস'র আসল স্পিড কিন্তু ওর চাইতে খুব বেশী নয়। তাছাড়া

বেচারার বউটার মাঝায় বাত না কি ছাই ; বাসায় বসে নিজেই সব লিখে আনে, আমি শুধু টাইপ করে দিই।

—তোর বস মিঃ গীল লোকটা কেমন ?

—ভারি স্মার্ট, দাড়ি কাটা পাগড়ি ছাড়া সর্দারজী ; একবার ওর ঘরে ঢুকলে কিছুতেই ছাড়তে চায় না।

—দল ছাড়া হাতী আর দাড়ি-পাগড়ি ছাড়া সর্দারজী নাকি সাংঘাতিক হয় ?

—আলুদোবটা একটু বেশী। কেবল লাইনের গল্প করতে চায় ; বলে, বাঙ্গালী মেয়ে আর এংলো ড্রেস ওয়াণ্ডারফুল ম্যাচ ! মিনি-স্কার্টের প্রতি দারুণ দুর্বলতা—'রিয়েলি এক্সাইটিং'। আমাকে জিজ্ঞাসা করে আমি পরিনা কেন ! হাড়ের টুকরোটা ছাতু করে পিষে ফেলে বলল, সব ঢাকা ঢোকা থাকাতেই গিলে খাচ্ছ ; ওদের মত খোলামেলা হলে'ত কামড়ে খেতে। তবে বুঝলি লোকটা একেবারে 'র' নয় ; গলা জলে নেবে ডুবে সাঁতার কাটতে চায়নি এখনও।

আমার বিয়ের চেষ্টা হচ্ছে কেমন করে যেন জানতে পেরেছিল বলল, এই আয়ে বিয়ে করার চাইতে একটা মেয়েকে গঙ্গায় ডুবিয়ে দেয়া ভাল। এর পর চামেলি আমায় অনেক জ্ঞান দিল। আটপৌরে মেয়ের সেকস সম্পর্কে অজ্ঞতা, দাম্পত্য জীবনে অশান্তি ; সংসার জীবনে কগড়া কাঁটাকাটি, সন্তানবাহিনী, হাজার সমস্যা, পয়সার ধাক্কা, হতাশা, নেশা ভাঙ ইত্যাদি। তবু মজা কি জানিস ? 'বিয়ে কোরনা' এই উপদেশ অবিবাহিতরা দিতে পারেনা। এক জোড়া পশু শান্তিতে জীবন কাটাতে পারলেও এক জোড়া মানুষ যেন কিছুতেই শান্তিতে থাকতে পারেনা। দারিদ্র্যের মধ্যে কোন বাহাদুরী বা মহত্ব নেই। কাম্য বস্তুগুলো সবই টাকার বশ। টাকা চাই, অনেক টাকা। আমার ব্যাগে কম করে তিন-চারশ টাকা না থাকলে আমারও বাথরুমে বসে কাঁদতে ইচ্ছে করে। তবে এও ঠিক যে টাকার সুখ কেনা গেলেও শান্তি পাওয়া যায় না ; আসলে যৌথভাবে বাঁচার আর্ট আমরা রপ্ত করতে পারিনা।

পাখির মত বইতে পড়া বুলি কপচাচ্ছে। ওর পয়সায় মোগলাই পরোটা-কষা মাংস খাচ্ছি, কাজেই জবাব দিয়ে ওকে চটাবার চাইতে মন কষিয়ে ওকে বগর বগর করতে দিয়ে নিজে কষা মাংসে মন দিলাম। ফুলটি যখন পাবই না ভ্রমর-মৌমাছি যে যা করে করুক, ইঁদুরের মত গোড়ারটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকি আমি।

*

বেশ ক'টা বছর কেটে গেছে। ইতিমধ্যে কলকাতার কেরানী জীবনের

আবর্তনে পড়ে গেছি। তবে খাবি খাচ্ছি না কারণ দুহাতে পয়সা কামাতে শিখে গেছি। বিয়েটা শুধু হয়নি, তিনটি সন্তানের জন্ম দিয়ে যৌন জীবনকে লাল ত্রিকোণে আবদ্ধ করেছি। প্রথমটি যা, দ্বিতীয়বারে তার বিপরীতটি, তৃতীয়তে যা পেয়েছ তাই নিয়ে খুশি থাক। আমার তিনটিই এঁড়ে বাছুর! রমা মেয়েটা ভাল। প্রাণ দিয়ে সংসার আঁকড়ে ধরেছে। ঝগড়া ঝাঁটি করেনা; চুরির পয়সার ওপর বাটপাড়ি করেনা। তিন সন্তানের জননীর সংসার আগলান ছাড়া আর কোন সাধ আহ্লাদ থাকতে পারে বলে ওর অন্তত জানা নেই। সন্তান সংসার স্বামী সকল এই চতুর্থ ধাপ পেরিয়ে ওর সুখভোগ স্বর্ণ-সাজ সিনেমা'র সপ্তম মার্গে উঠতে পারনি। রেলের বাবুরা রেল গাড়িতে চড়ার পাশ পাওয়ার মত করপোরেশনের বাবুদের করপোরেশন চৌহদ্দির মধ্যে থাকবার কোন পরিকল্পিত ব্যবস্থা নেই। বাম হাত ও বামার দয়াতে আমি চৌহদ্দির মধ্যেই বসবাস করতে পারছি! একেবারে ধর্মের পীঠস্থান কালীঘাটের খুব কাছেই কালী মন্দির থেকেও খুব দূরে নয়। এ হেন ছাপোষা জীবনে আর যাই থাক চামেলির সাথে ঘনিষ্ঠতার কোন সুযোগই ছিল না। দুটি গ্রহ তাদের নিজ নিজ কক্ষপথে ঘুরছে।

এটুকু জানতাম চামেলি তার জীবন দর্শনের মই বেয়ে ধাপে ধাপে অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। বালিগঞ্জের হোষ্টেল ছেড়ে মধ্য কলকাতার অবাঙালী অঞ্চলে ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে সুন্দর সাজিয়ে গুজিয়ে আছে। আমার বিয়েতে এসেছিল বসে'র গাড়ি চড়ে। রমার জন্যে একখানা অতি দামী শাড়ি হাতে। আমাকে বলল, বউ নিয়ে সুখে ঘর করতে পারবি, একেবারে সীতার ধাঁচে গড়া। প্রথম ছেলের মুখে ভাতেও এসেছিল। একটা সুন্দর প্যারামবুলেটর উপহার দিয়ে বলল, "জনসংখ্যা বাড়িয়ে যা; তবে দেখিস বউটা যেন সূতিকারুগী না হয়ে পড়ে। আমার দিদিমার মুখে শুনেছি দাদামশাই নাকি বউয়ের খালি পেট পছন্দ করতেন না; সে সময়ে নাকি সেনেটারি তোয়ালে টোয়ালের দরকারই হ'ত না।" আমার প্রশ্নের জবাবে বলল, 'সব মেয়েকেই যে বিয়ে করে গোলামি করতে হবে এমন কোন দিব্যি নেই। বিকোতেই যদি হয়'ত বেশী দামেই বিকোব। প্রাতঃ স্মরণীয়া পঞ্চ কন্যার অন্যতম দ্রৌপদী পাঁচ স্বামী নিয়ে ঘর করাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়নি! এ যুগের দ্রৌপদীদের কোন ঝামেলা পোয়াতে হয় না। এ যুগের পাণ্ডবরাও আর বিয়ে করা সোয়ামী নয়। জুয়োতে হেরে বন্ধক দেবার সুযোগ নেই। নিরালা ঘরে মৃদু আলোয় বস্ত্র হরণ হলেও কুরুক্ষেত্র বাঁধার কোন চান্স নেই। জীবনটা দুদিনের। টাকা কামাও, ওড়াও, ফুর্তি কর। সংসার জীবন

'হরিবল। হয় ঝগড়া, নয়তো গোমরা। বাতি নিভিয়ে বিছানায় যাও কর্তব্য পালন কর। তারপর 'ওয়ান কাইন মর্নিং' পেটে বাচ্চা। ঘুঁষ খাওয়া এ গোলামি আমার সইবেনা।"

চামেলির সন্ধ্যা গোমরামুখো স্বামীর সঙ্গে কাটাতে হয় না, ডকটর চ্যাটার্জী, মিঃ ভাট, মিঃ দেশপাণ্ডে, মিঃ দেশাই মিঃ আগরওয়াল—নিত্য নতুন সুন্দর সুপুরুষ বান্ধব; চলমান জীবনে চলমান মানুষ। অঢেল টাকা। কোন্ মেয়ে চায়না অমন সব কুতুবমিনারদের সঙ্গ। সিনেমার নায়ককে কামনা করে রাত জাগার চাইতে অনেক ভাল। সন্ধ্যা থেকে হৈ চৈ আনন্দ উল্লাস ভালবাসা—হলই বা তা অভিনয়! ফুর্তির পেয়ালা উপচে পড়ে; যত পার পান কর; নামজাদা হোটেল-রেস্তরাঁয় সেরা সেরা খানা ফেলে ছেড়ে খাও; তারপর টাকার গদিতে গা এলিয়ে দাও উচ্ছ্বাস-উন্মাদনা বৈচিত্র্য—এই না হলে জীবন। অথচ কোন দায় দায়িত্ব নেই।

—জানিস পটলা, এবার আমি গাড়ি কিনবো; আনকোড়া নতুন গাড়ি।

—তোর গাড়িতে আমাদের চড়াবিনা?

—তোদের দৌড়ত' দক্ষিণেশ্বর অথবা বেলুড়। আমাদের মত পাপী তাপীর গাড়িতে ওসব স্থানে যাওয়া ঠিক হবে না।

—তোর সম্পর্কে আরো বিশদভাবে জানতে ইচ্ছে করে।

—কেন, গল্প-টল্প লিখবি নাকি?

—নারে আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে ও জগৎটা সম্পর্কে।

—যেতেও ইচ্ছে করে বল। বউয়ের সামনে খবরদার এসব কথা বলিস না যেন।

—মেয়েদের কিছু বলতে হয় না এ ব্যাপারে, তোরা আড়চোখে একবার দেখে নিয়ে সব বুঝতে পারিস।

—তোকে বারণ করেনি আমার সাথে মিশতে?

—রমা তোর ভাগ্যকে ঘৃণা বা হিংসা করে কিনা জানিনা; তবে তুই যে আমাদের কোন ক্ষতি করবিনা সেটা ও বোঝে।

—আমি যা করি তোদের নৈতিক মানদণ্ডে সেটা খুবই গর্হিত কাজ। তোকে সত্যি কথা বলছি, লোভের বীজ আমার মধ্যেই ছিল, কলকাতার সুফলা মাটিতে তা ফুলে-ফলে ভরে উঠেছে। এখন দিনে দু'চারশ টাকা রোজগার করা কিছুই না।

—এত টাকা শুনেছি কেবলমাত্র বিলেত ফেরৎ বড় ডাক্তার ও ব্যারিস্টার উপার্জন করে।

—কেন, আমায় যারা দেয় সেই সব রথী মহারথী ব্যবসাদারদের আয় কল্পনা করতে পারিস ?

—এত টাকা দিয়ে কী করিস ?

—টাকার প্রতি লোভ না থাকলে টাকা খরচ করা কিছুই না। লীলাকে তোর মনে আছে পটলা : জজ সাহেবের নাতনী ? একবার স্বরস্বতী পুজোয় ওর মায়ের একখানা চওড়া জড়ি পাড়ের বেনারসী পরে এসেছিল। লীলাকে মোটেই মানাচ্ছিল না—একথা ওকে বলতে ও আমায় বলেছিল 'দৌড়ত টাঙাইল অবদি এ শাড়ির মর্ম কি বুঝবে।' সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম নিজের ক্ষমতায় একদিন ওর চাইতে দামি শাড়ি পরবো। বলতে পারিস আমার এ শাড়িটার দাম কত ?

—হবে শ দেড়েক টাকা।

—শ'দেড়েক আমার ব্লাউজ ব্রেসিয়ারের দাম ; এ শাড়িখানার দাম ছ'শ টাকা ! ঠিক আছে, তোর বউকেও একখানা আনিয়ে দেব। আর শোন, তোর কোন বেকার শালা-টালা থাকলে বলিস—চাকরি জুটিয়ে দেব। তবে পাচকান করবি না ; বাড়ির সামনে লাইন পড়ে যাবে।

চামেলি খোলা বাজারে বিকোয় না। এক সন্ধ্যায় একজনের বেশী খদ্দের নেয়না। সাতদিন আগে 'বুক' করতে হয়। যারা আসে তারা প্রায় সব বড় চাকুরে ; আর যাদের পয়সায় আসে তাদের অধিকাংশই ব্যবসাদার, শিল্পপতি অথবা ঠিকদার। রাত বারোটো অবদি চামেলি সঙ্গ দেয়। কোন বেহুস খদ্দেরকে রাতভর আশ্রয় দিতে হলেও চামেলি নিজের ঘরে চলে যায়। ওর খদ্দেরা অধিকাংশ বাবুই গেলাসে কাবু, 'ক্লাইমেকসে'র আগেই যবনিকাপাত ! ব্যবসায়ীরা ব্যবসা দেনেয়ালাদের এখানে ধরাশায়ী ক'রে ব্যবসা লুটে নেয়। "আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয় লেনদেনের মাধ্যম হিসাবে। দাম্পত্য জীবনে সুখ দেয়া নেয়া চলে ; আমাদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র দেবার ; প্রাপ্তিযোগ যা ঘটে সেটা মুদ্রায়। কাজেই লুটের মালের যতটা পারি গুছিয়ে নিই। তবে কারো কারো মক্কারাস্তের হিসেব ঠিক থাকে and they are really interesting।"

—নিজের প্রতি তোর ঘেন্না হয় না ? কোথায় নেমেছিস তুই ?

—তোর লেকচার থামা, জানিস, আমরা না থাকলে পৃথিবীর শিল্প ব্যবসা

বাণিজ্য সমস্ত 'কোলাপ্‌শ' করবে। লুটপাট করা যদি অপরাধ না হয় লুটের অংশ নেয়াতেও কোন অপরাধ নেই। আমার কাছে যারা আসে তারা সব উচ্চ বংশের উচ্চ শিক্ষিত এবং উচ্চ চাকুরে ; সব মোটা মোটা টাকা মাইনে পায় ; অধিকাংশের ঘরে সুন্দরী ও উচ্চ শিক্ষিতা স্ত্রী আছে। ফুর্তির জোয়ারে জীবন ভাসিয়ে দেশ ও দশের সর্বনাশ করছে। তারা করছে মগজের বেশ্যাবৃত্তি। আমি গেরস্ত সেজে একাজ করিনা। জানিস, কত ভদ্রঘরের মেয়ে বউ লুকিয়ে এই ব্যবসার পাঁক গায়ে মাখে !

এর পর চামেলি একটা গল্প বলল। শুনেত আমি একেবারে থ বনে গেলাম। এক বাঙ্গালীপুঙ্গব ওকে ভাড়া নিয়েছিল স্ত্রীর ভূমিকায় এক সন্ধ্যা অভিনয় করতে হবে। এক হাজার টাকাতেই সে রাজি হল এবং অগ্রিম দিল। লোকটা পদোন্নতির জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। ওর পদোন্নতির কর্তা এক আমেরিকান ছোকরা হোমে বদলি হয়ে যাবার কদিন আগে মরিয়া হয়ে বাঙ্গালী পুঙ্গব বউকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করে বসল ; সাহেবকে ডিনারে নেমন্তন্ন করল এবং সাহেব খুশিমনে সে টোপ গিলে বসল। বউ যখন জ্বলে রেগে মেগে সোজা উত্তরে হাঁটা দিয়ে উত্তরপাড়ায় গিয়ে বাপের নিরাপদ আশ্রয়ে ঠাঁই নিল। সে রাত্রে চামেলি নাকি দারুণ অভিনয় করেছিল। সাহেব আসার পর বাবুটি গাঙ্গুরামের দই আনতে গেলত গেলই। "আমেরিকান ছোকরা আমায় পেয়ে ভারি খুশি' দারুণ আপসোস হোল ; চলে যাওয়ার মাত্র কদিন আগে আমার সাথে পরিচয় হল বোলে। সাহেবের বাচ্চা ! কোনটাতেই কমতি যায় না। তবে মাত্রাজ্ঞান আছে। দুই পেগ খেল ; তারপর এক পেগ ডাল করতে করতে। তারপর আমায় জিজ্ঞাসা করল 'Do' you feel hot ? আমি বুঝলাম its not a question, but an invitation ! ব্যাটা সুদে আসলে পুষিয়ে নিল ! আমায় একটা long kiss করে বলল, I like Bengalee bitch, আমি ওর গালে একটা হাল্কা কামড় দিয়ে বললাম, I too like American bastard। গলার দামী লকেটটা দেখিয়ে বলল—সাহেবের উপহার।

মাত্র কটা বছরের মধ্যে মফঃস্বলের মেয়ে চামেলি মিত্র, মিস মিত্রা, মিলি পেরিয়ে মিস মিটার-এ উত্তীর্ণ হয়ে গেল। এরপর দীর্ঘদিন আর চামেলির খোঁজ খবর রাখিনি ; সেও রাখেনি। দু'ট উপরি পয়সার ধান্ধায় সদা ব্যস্ত থাকি। একদিন আমাদের লাইসেন্স বিভাগের পাঁচকড়ি জানাল, তোমার সেই মেয়েটি অমুক

জায়গায় একটা ভারি সুন্দর 'বিউটি পারলার' খুলেছে। লাইসেন্স ইত্যাদি ঠিকঠাক থাকা সত্ত্বেও আমায় পাঁচটাকা দিয়েছে; আমি পৌর সংস্থার লোক জেনে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করল; তোমায় একবার দেখা করতে বলেছে, পারলে একবার যেও গুরু! আমি দেখেই চিনেছি; ও মেয়েকে যে একবার দেখেছে…।" পাঁচকড়ি মুখ দিয়ে একটা বিশ্রী আওয়াজ করল। "দেখলাম বেশ ক'টি ভাল মাল পুষেছে, দেখে চোখ সার্থক করে এস; আমি হলে 'ত রোজ যেতাম!"

কদিন ধরে কৌতূহলটা মন মোচড়াতে লাগল। এক দুপুরে গুটি গুটি বেরিয়ে পড়লাম। মিলিমিটার বিউটি পারলার—সুন্দর সাইনবোর্ড! দেয়ালে সুন্দরী নারীমূর্তি মনোগ্রাম করা। বহুটাকা খরচ করেছে সাজাতে। সত্যি চামেলির সৌন্দর্যবোধ আছে! রিসেপশনের ডেকরেশন দেখে আমার মাথা ঘুরে গেল। স্লিপ পাঠালাম। বেয়ারা এসে আমায় মেমসাবের ঘরে নিয়ে গেল। মেমসাহেব ক্লাস নিচ্ছেন। একটু সময়ের মধ্যে এসে পড়বেন। বেয়ারা আমায় কোল্ড ড্রিংকস ও সিগারেট দিয়ে গেল; বুঝল আমি মেমসাহেবের খুব পেয়ারের লোক। অপূর্ব ভাবে সাজিয়েছে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত মস্ত ঘরখানা। দেওয়ালগুলো নানা রঙে ডিস্টেম্পার করা। তৈলচিত্র নানা রকমের আর্ট-ওয়ার্ক, ছোট ছোট মূর্তি সেকস থেকে সেকস আর্ট!

চামেলি এসে ঢুকল। ও প্রায় আগের মতই আছে; একটু যেন মুটিয়েছে! ওর মনটা ছোট বেলা থেকেই খুব সহজ ও উদার, কোন জটিলতার ধার ধারেনা। আমাকে দেখে ও খুব উচ্ছ্বসিত হ'ল। আগের মত চড়-চাপড় মারলনা; ইতিমধ্যে আমাদের সম্পর্কটা কালের আবর্তনে 'তুই' থেকে 'তুমি'-তে উন্নতি হয়েছে।

—আমি জানতাম তুমি আসবে; একবার এসে অন্তত খোঁজ নেবে কেন এই ভোল পাল্টানো! ওর চোখের নীচে কালশিরা; মুখে ক্লান্তির ছাপ।

—মিলিমিটারের আয় কি মিলি বা মিস মিটারের চাইতেও বেশী?

—না, টাকার কথা ভেবে এসব করিনি। যা জমিয়েছিলাম সব ঢেলে এক নতুন খেলা, নিজের দেহকে কেন্দ্র করে যে ব্যবসা তা বেশীদিন স্থায়ী হয়না; তাই স্থায়ী কিছু একটা করার চেষ্টা। তবে একা আর পারছিনা, নইলে অনেক বড় করা যেত। তুমি যদি আমার সাথে যোগদান কর তবে তোমার হাতে কিছু দায়িত্ব দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি, you are my first and the longest love। বাইরের লোক এসে আমায় দারুণ চোট দিয়েছে। বল তুমি রাজি? মাস-মাইনা পার্টনারশিপ—anything!"

—পার্টনার! আমি কিছুটা অভিভূত হয়ে ওর প্রতি তাকালাম।

—তবে তুমি আসবেনা জানি বলেই সম্ভবত প্রস্তাবটা এত সহজে করে ফেলাম।

—আসবো জানলে নিশ্চয়ই করতে না?

—আরো ভেবে চিন্তে আট-ঘাট বেঁধে করতাম যাতে আর তুমি আপত্তি করতে না পার।

—তোমার এই নতুন কারবারটা কী নিয়ে একটু বুঝিয়ে বলবে?

চামেলি মনে মনে বক্তব্য গুছিয়ে নিল। এখানে ত্রিধারার কাজ হয়। প্রথমত, এখানে বিয়ের ক'নে সাজান হয়, বিয়ে বাড়ি বা পার্টি-ফার্টিতে যাবার জন্যে অনেক মেয়ে বউরা এখানে সাজতে আসেন; এছাড়া, পয়সাওয়ালা ঘরের অনেক বিবাহিতা উইক-এণ্ড মেক্‌আপ নিতে এখানে আসেন। তোমার বউকে একবার পাঠিয়ে দিও এমন দিব্যি করে সাজিয়ে দেব চিনতেই পারবেনা। এক এক উইক-এণ্ড-এ এক এক রকম সাজ! খুব উত্তেজক ব্যাপার! কিন্তু জান এটা খুব effective। কারণ পুরুষরা মুখ্যত বহুচারী হয়েও অধিকাংশকেই এক নারী নিয়েই জীবন কাটাতে হয়, সে ক্ষেত্রে একই যদি বহুরূপিনী হতে পারে, not bad! দ্বিতীয় পর্যায়ে রূপ-চর্চা, রূপ-রক্ষা এবং যৌন জীবন সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে। নানা প্রক্রিয়ায় একটা মানুষের চেহারার আদল পাল্টে দেওয়া যায়। রূপ অনেকটা ফুলের বাগানের মত: বাগানের সৌন্দর্য তার মালিক ও মালীর ওপর নির্ভর করে। তোমাকে লুকিয়ে দেখাতে পারি; কিন্তু তোমার বাগান ঘুরে টুরে যেতে পারে, অপ্সরাদের দেখে দেবতা ও মুনি ঋষিদের যেমনটি হ'ত! অনেক মেয়ে এই বিভাগে কাজ করে; এমনকি কলেজ পড়ুয়ারা এসে পার্ট-টাইম করে। ক'জন পুরুষও আছে। কিছু পারভার্ট মহিলা পুরুষ দ্বারা শরীর চর্চা পছন্দ করেন! রূপসী হলেই ত চলবে না, রূপ মেনটেন করতে হবে এবং এক্ষেত্রেও অনেক অনেক জানার আছে। সেটাও এখানে শেখান হয়।

—বেয়ারা বলল—মেমসাহেব ক্লাস নিচ্ছেন। তা ক্লাসটা কিসের?

—আমরা সার্ভে করিয়ে দেখেছি, মেয়েদের যৌন-জীবন সম্পর্কে অজ্ঞানতা, ভুল ধারণা এবং passive approach এদেশে বহু দাম্পত্য জীবনে ফাটল ধরার কারণ। বিশেষ করে বাচ্চা হবার পর এদেশের অধিকাংশ মেয়েই মুখ্যত মা হয়ে যায়, স্ত্রীত্ব ও মাতৃত্বের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারেনা। এই বিভাগে আমরা ওয়াণ্ডারফুল রেজাল্ট পেয়েছি; প্রায় সেন্ট পার্সেন্ট। বহু যৌন জীবন-

তথা দাম্পত্য জীবনকে আমরা ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়েছি এবং এই বিভাগে আমাদের আর সব চাইতে বেশী ! তবে ধ্বংসের কারণ যেখানে পুরুষ, সেখানে আমাদের কিছু করণীয় নেই।

—ব্যাপারটা কি এতই সহজ যে চাল ডালের মত বেছে আলাদা করা যায় !

—সহজ নয় ঠিকই after all conjugal life is a difficult art and a great art of life ! তবে রোগ ধরা যায়।

—পুরুষরা কি ভাবে দায়ী ?

—পুরুষরা এ ব্যাপারে বড় স্বার্থপর ; after all this is not an one sided game ! দ্বিতীয়ত এদেশের পুরুষরা বউকে সাথে নিয়ে মদ খায় না, মদ খেয়ে বউয়ের কাছে আসে ; এটা মেয়েদের মানসিকতাকে ভীষণ বিপর্যস্ত করে। মেয়েদের জন্যে এখানে ক্লাসের ব্যবস্থা আছে, যেখানে ব্যাপারগুলো বোঝান হয় স্লাইডের সাহায্যে। একদিন সন্ধ্যার পর সুযোগমত এলে স্লাইড দেখতে পার। ওসব দেশে শুনেছি প্র্যাকটিক্যাল ডেমনস্ট্রেশনের মাধ্যমে বোঝান হয় !

—ওদেশে শুনেছি সেক্স-লাইফ প্রায় open ব্যাপার করে ফেলেছে ?

—কিন্তু সেটা ভাল হচ্ছেনা। তবে এদেশে অমনটা হবেনা কারণ ভারতের সনাতন কামশাস্ত্রের একটা স্বকীয়তা আছে এবং তার পরোক্ষ প্রভাবও পড়েছে ভারতীয় যৌন-জীবনে ; ওদের কাছ থেকেও শিখবার অনেক কিছু আছে—mainly emancipation of sex-life.

—তুমি এত শিখলে কোথ্ থেকে ?

—প্রথমত অভিজ্ঞতা, দ্বিতীয়ত দেশী-বিদেশী বহু পত্র-পত্রিকা আমরা নিয়মিত পড়ি। তাছাড়া, তোমার জানবার কথা নয় কিন্তু আমরা যারা এ লাইনে আছি, জানি এই বিষয়ে বহু কোয়ালিফায়েড এক্সপার্ট আছেন। প্রয়োজনমত আমরা তাঁদের advice ও service নিয়ে থাকি।

—খান কয়েক পত্রিকা দাওনা, অবসর সময়ে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখব।

—লুকিয়ে দেখবার কিছু নেই ; বরঞ্চ অতি যত্নে openly এই আর্ট সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া দরকার।

কেক্-প্যাটিস কফির সাথে দামী সিগারেট ; কার আর উঠতে ইচ্ছে করে।

—জানি এ কাজ করতে গিয়ে আমরা আর একটা জিনিস আবিষ্কার করেছি। দাম্পত্য জীবনে যদি ভারসাম্য বজায় থাকে, যৌন তথা দাম্পত্য জীবনকে যদি

কিছুটা আর্টের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায় তবে সমাজের বুক থেকে অনেক অশান্তি, দুর্নীতি দুরাচার দূর হয়ে যায়।

—সবই না হয় মেনে নিলাম, কিন্তু রূপহীনে রূপ দান·····

—আধঘন্টা সময় দাও দেখ তোমায় কেমন সিনেমার নায়ক করে দিচ্ছি। শোন তোমায় একটা গল্প বলি—সত্য ঘটনা। মেয়েটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত; ছেলেরা ওর পেছনে লাগল; নাম দিল 'গোময়া সুন্দরী', মেয়েটা উত্যক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত নীড়ভাঙা পাখির মত আমার কাছে এসে হাজির হ'ল। দেখলাম সুন্দরী বটে মেয়েটা; কিন্তু ওর রূপের সর্বনাশ ঘটাচ্ছে ওর রূপের দম্ভ। মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য ও বিরক্তিভাব ভগবান নিশ্চয়ই লেপে দেননি অমন সুন্দর মুখে! ভগবান তেমন বেরসিক নন। আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে ওকে সব বোঝালাম। দেখালাম সহজ হলে, হাসতে পারলে ওকে কেমন সুন্দর দেখায়; বোঝালাম, ছেলেদের অমন অবহেলা না করলে তারাও তোমার মত সুন্দরী মেয়েকে পদে পদে জব্দ করতে চাইবে কেন। And you guess the result! এক বছরের মধ্যে মেয়েটা একটা স্মার্ট ও হ্যাণ্ডসাম ছেলেকে সাথে করে আমায় ধন্যবাদ জানিয়ে গেল। আমিও ওদের wish করলাম ও একখানা ভাল বই উপহার দিলাম। ছেলেটা আমায় বলল, অনেক রকম শিল্প বা কারবারের কথা শুনেছি, but applied aesthetics। আমি জবাব দিলাম, well, life is the greatest form of art and we just give push towards that direction। কফির পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে চামেলি বলল, So you see Sanjeeb, all's still not well with Adams and Eves।

—এতই যখন করেছ, একটা জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করলে সরকার থেকে কিছু টাকা পেতে।

—আমি যাদের নিয়ে কারবার করি তারা নিজেরাই এমন নিয়ন্ত্রণ করেছে যে কিছু শিথিলতা থাকলে ভাল হয়—we are losing quality to quantity।

—এতই যখন শিখেছ এবার বিয়ে-থা করে একটা আদর্শ সংসার কেঁদে দেখাওনা।

—এ কাঠামোয় ওসব আর হবেনা সঞ্জীব; জানত মেলায় মেলায় ঘুরে যে জিনিস বিক্রি করেছে, একটা ছোট দোকান ঘরে তার মন বসান মুস্কিল। তাছাড়া আমায় নিয়ে ঘর করতে কোন ছেলে রাজিই বা হবে কেন। তুমি স্ত্রী থাকলে I could be a good housewife।

* * *

সময় যে শুধু টাকার চাকায় চলেনা সেটা উপলব্ধি করতে পারলাম বছর না ঘুরতেই। আমাদের চতুর্থ সন্তান, একটা কন্যা রত্ন উপহার দিয়ে রমা চির বিদায় নিল। সিজারিয়ান অপারেশনের সেলাই ছিঁড়ে তিন দিনের মাথায় রমার প্রাণটা পচে গলে বেরিয়ে গেল আমার অসীম সমুদ্রে ফেলে। সন্তজাতার প্রতি তাকিয়ে সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল, শিশুটি তাকাল বিশ্বের প্রতি, আমি তাকালাম ডাক্তারের প্রতি, ডাক্তার তাকালেন আকাশ পানে।

রমা চলে গেল। সংখ্যাগত ভারসাম্য বজায় থাকলেও সংসার ওলট-পালট হয়ে গেল; প্রশান্ত মহাসাগর ঝড়ে উথাল পাথাল, জাহাজ ডুবুডুবু। তোমার ঘরে সমস্যা বলে সময় দাঁড়িয়ে থাকবেনা তোমার দোরে।

বড়টি সবে আট ছাড়িয়েছে, ছোটটি আট দিনের। চার চারটে শিশুর ভাগ্যের হাল ধরা আমার সাধ্যের বাইরে। সন্তজাতা গৃহে প্রবেশ করেছে নার্সিংহোম থেকে ভাড়া করা মাসির কোলে চেপে। টাকার বিনিময়ে মায়ের সেবা পাবো কোথায়। ভাড়া করা মাসি ঘুমায়, আমি রাত জেগে বসে থাকি; কিন্তু একটা তুলতুলে বাচ্চা, নাড়াচাড়া করতেও ভয় লাগে; ঘাড়-টার যদি মটকে যায়। রাঁধুনী, ঝি, মাসি—বাড়ি সরগরম। কিন্তু বাচ্চাগুলোর মুখের প্রতি তাকাতে পারি না। আমার লোভের ফল! এদের পৃথিবীতে এনে কত যে অপরাধ করেছি আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারছি।

বাচ্চাটা ঘুমিয়ে থাকে; ঘুমের মধ্যে হাসে; ভ্রূ কুঁচকে বিরক্তি প্রকাশ করে; কচি কচি হাত দু'ট মুঠো করে। পা ছোঁড়ে। পাখির সাথে ওদের ঘুম ভাঙে তখন ওরা খেলা জুড়ে দেয়। ভোর বেলা ঘুম ভেঙে বাচ্চাটা ওর মাকে খোঁজে, বুকের দুধ খাওয়ার সময়ে পাশে বাপের লোমশ বুক—শিশু কেন ক্ষেপে উঠবে না! সে কেঁদে উঠে প্রতিবাদ জানায় আমি তুলোর পলতেটা ওর মুখের কাছে ধরলে একটু চুসে ঠেলে বার করে দেয়; ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে অভিমান প্রকাশ করে। আমি ভগবানকে স্মরণ করি—তোমার বিচারে কি সন্তোজাত শিশুরও রেহাই নেই? মা মরে'ত শিশু বাঁচেনা! ছোটটার হ'ল কাশি মেজটার জ্বর; বড়টা বড়ই দুরন্ত, এখন কেমন নির্জীব হয়ে পড়েছে, ক্যাল ক্যাল করে আমার প্রতি তাকিয়ে থাকে।

ছুটি নিয়ে নিয়ে কোন কিছুই সুরাহা করতে পারলাম না। দেশের বাড়িতে এমন কেউ নেই যে এসে সাময়িক ভাবে হাল ধরে। প্রতিবেশী আর কতদিন

সাহায্য করতে পারে। তাদেরও সংসার আছে, আর কোন্ সংসারে ঝামেলা নেই! রোজ ষোল টাকা করে দিয়ে মাসিকেই বা কতদিন রাখা যায়। বড়বাবুর স্ত্রী কদিন পর পর এসেছেন : এখন সময় পেলেই আসেন। বড়বাবু চালাও ছুটি দিয়েছেন। একদিন বড়বাবুই আমায় পরামর্শ দিলেন, "এ ভাবেত বেশী দিন সামলাতে পারবেনা তারা ; ওদের কোন মিশনারী আশ্রমে দিয়ে দাও। শুনেছি ওরা খুব যত্ন করে। টাকা পয়সা তুমি দেবে কাজেই ওদের অনাথ-আতুর হিসাবে গণ্য করবে না : তুমি নিয়মিত দেখাশুনা করবে এবং সুযোগমত আবার বাড়ি নিয়ে আসবে।" ক'দিন সারা কলকাতা চষে বেড়ালাম ; কিন্তু সে রকম কোন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে পারলাম না ; যার প্রয়োজন সব চাইতে বেশী সেই ছোটটিকেই কেউ রাখতে চায়না। শেষ অবধি চামেলির শরণাপন্ন হলাম—ওর অনেক বড় বড় সোর্সের সাথে যোগাযোগ আছে।

ধৈর্য্য ধরে সব শুনল চামেলি। অনুযোগ করল কেন তাকে সময়মত জানাইনি ; রমাকে একবার দেখে আসত অন্তত। আমায় একটা দিন সময় দাও সঞ্জীব, দেখি কতদূর কি করতে পারি। আমি ভরসা পেয়ে ঘণ্টা গুণতে লাগলাম।

চব্বিশ ঘণ্টা কেটে যাবার ঘণ্টা কয়েক পরেই একখানা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। তা থেকে চামেলি বেরিয়ে এল, সন্ন্যাসী পূজারিণীর বেশ!

—একটা উপায় ঠিক করেছি তাই চলে এলাম। সুটকেশটা নামাও। একি দরজা আগলে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ; আমায় ঢুকতে দেবেনা নাকি? আমি কিন্তু পাকাপাকি ভাবেই চলে এসেছি! পাগল করা চামেলির অবাক করা রূপ।

—সে কি! তুমি চলে এলে! তোমার অমন কারবার!

—সে সব'ত আগেই কো-অপারেটিভ ব্যবস্থা করে-দিয়েছি : সবাই মিলে চালাতে পারলে চলবে।

—চামেলি, তুমি কেন এই পাগলামিতে মাতবে? অসুবিধায় পড়েছি ঠিকই, কিন্তু…!

—সঞ্জীব, আমি তোমার জন্যে আসিনি, কাজেই তোমায় কোন কৈফিয়ত দিতে বাধ্য নই। যাদের কাছে এসেছি তাদের পবিত্রতা আমি নষ্ট করবোনা এবং সময় হলে আমার জীবনের সমস্ত কৈফিয়ত আমি তাদের দেব। আরে কি মুস্কিল, সাত তাড়াতাড়ি দৌড়ে এলাম সোনামুখগুলো দেখব বলে আর তুমি কিনা দোর গোড়ায় দাঁড় করিয়ে রাখলে।

—সত্যি বলত সঞ্জীব, তুমি আমায় ঘৃণা কর বলে এমন ইতস্তত করছ কিনা ?

—অতীতেও তোমাকে কখনও ঘৃণা করেছি কিনা সেটা আমায় তলিয়ে দেখতে হবে। এই মুহূর্তে আমি আত্মগ্লানিতে জ্বলে পুড়ে···

—ছি ছি সঞ্জীব, ওসব কথা সব সময়ে বলা চলে না। আমাদের পাপ, আমাদের লোভের জন্যে অবুঝ শিশুরা কেন কষ্ট পাবে ? আমার কথা আমি ভেবেই এসেছি। আমি ভাল-স্ত্রী তৈরির কারবার করছিলাম ঠিকই, কিন্তু মাতৃত্বকে বাদ দিয়ে নয়। প্রকৃতি স্বয়ং আমাদের মধ্যে মাতৃত্বের বীজ রোপন করে দেয় : সে শক্তি সুপ্ত থাকলেও কুম্ভকর্ণ নয় ; অতি সহজেই তাকে জাগান যায় ; আর একবার জাগলে সে কিন্তু জাগ্রত কুম্ভকর্ণ ! তোমার মুখ থেকে সব শোনা অবধি আমি অনেক কথা ভাবছি। মৃত্যু মানুষের গড়া আইন-কানুনের দেওয়াল ভেঙে তছনছ করে দেয় ; আর জন্ম মৃত্যুই হচ্ছে একমাত্র শাশ্বত নিয়ম। আমি পরিশুদ্ধ হয়ে এসেছি। তবু তোমার অসহ্য হলে তুমি একটা মেসটেস-এ গিয়ে থেকো ; কচি কচি কটা শিশুকে আশ্রমে পাঠানোর চাইতে সেটা অনেক কম কষ্টের হবে।

আমি চামির একখানা হাত চেপে ধরলাম, 'তুমি জাননা চামি এ কোন্ পাগলামিতে মেতেছ তুমি।' ওর ধরা হাতে এক ফোঁটা জল পড়ল ; বোঝা গেলনা যে তার দাবিদার কে এবং আনন্দের না দুঃখের !

সঞ্জীব, তোমার হয়ত ধারণা হতে পারে আমি ঝোঁকের মাথায় সব কিছু করি। পাগলামি করি ঠিকই, তবে সব পাগলামি ঝোঁকের মাথায় নয়। লোভের আগুনেই আমার লোভ পুড়ে মরেছে। আমার আলাদা কোন জগৎ নেই। ফুল নিয়ে আমার গবেষণা, এবার কুঁড়ি থেকে সে গবেষণা সুরু করবো। মিলিমিটার সাইন বোর্ডের আড়ালে যে মানুষটা সে কিন্তু আসলে চামেলি মিত্র—তোমাদের চামি গো।

চামেলি আমাকে প্রায় ধাক্কা মেরে সরিয়ে ভিতরের ঘরে চলে গেল। আমি যেন রমার গলা শুনতে পেলাম—'আহারে, বাছা আমার কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে !'

অশোককুমার সেনগুপ্তের গল্প

এক জোড়া হাঁস ও সুশীলা

পাগল মানুষটা! কলমকাঠি ধানের ভুঁইয়ে দক্ষিণের আলে দাঁড়িয়ে শম্ভু সরকার। গুচ্ছগুলির মধ্যে ইতি উতি চোখ ঘুরছিল। তুলে এবার সামনে চাইতেই ঘুরে দেখা গেল ওকে। বট্ করেই মনে হল, পাগল মানুষটা। আল ভেঙে আসছে। কোমর সমান আশ্বিনের ধান লকলক করছে। কোমর থেকে উপরের অংশটা ভাসছে যেন। খালি গা, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। কোমরে নিশ্চয় লুঙি। রঙ দেখা যাচ্ছে না। বোঝা যেত তাহলে। সুশীলা সবুজ রঙের লুঙি কিনে দিয়েছে ভবানীপুরের হাটে।

শম্ভু সরকার মুখ ঘুরিয়ে নিল। আবার হাতড়াতে থাকল তার চোখজোড়া দু'কানও খাড়া। শব্দ শুনলেই এগিয়ে যাবে। এক জোড়া হাঁস। সোজা কথা। হারামজাদা বদনা যখন কাল বিকেলে ঘরে তুলেছে, তখন দেখেনি। গুণে গুণে ছাড়বি, গুণে গুণে ঢোকাবি পই পই পই করে সে বলে দিয়েছে। সকালে সে ডিম বের করতে গিয়ে গুণল বলেই না। দু'টো কম। ষোলটা রয়েছে। বদনা স্বীকার করল সে কাল ঢোকায় নি। ঢুকিয়েছিল ছোট বৌ। ভাসুর হয়ে তো আর তত্ত্বপান যায় না। বদনাকেই ঝাল ঝাড়ল। কিন্তু তাতে তো হাঁস আসবে না। বেরিয়ে পড়েছে আনতে। বদনাকেও লাগিয়েছে। ওই যে ছোঁড়া আলে পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে। বড় পুকুরে চড়ে। থাকবে আশেপাশে ধান ক্ষেতে। শেষ আশ্বিন। দুধ গিলে শীষগুলো টসটসে। শালার জাতের পুকুরে গেঁড়ি শামুকে মন ভরে না। ঠিক ক্ষেতে যায়। আর সেয়ানা কম! ঠোঁটে শীষ নামিয়ে কপ্ কপ্ গেলে। ব্যস্ সব্বে হয়েছে, হুঁস নেই শালার জাতের। খেয়েই চলেছে হয়ত। হজম করতে তো ওস্তাদ। আধুলি নাকি হজম করে ফেলে। আধুলি খাইয়ে হাঁস আধঘণ্টা পরে কাটতে পেটে নাকি আধখানা বেরিয়েছিল। আধখানা হজম। শোনা কথা। ভাবনা তার জন্য নয়, ভাবনা নিজেরাই হজম হয়ে গেল কি নয়। তাহলেই চিত্তির। সকালে উঠেই অন্ততঃ ছাব্বিশটা টাকা লোকসান! কম কথা।

হাঁস হাতড়ান থেকে চোখ আবার উঠল শম্ভু সরকারের। পাগল মানুষটা নাকি? ধেৎ শালা! হল ত হল। তার এত কিসের। হাঁস খুঁজুক। জোর

কোর কোর কোর। সুর করে ডাকতে থাকল শম্ভু সরকার। কপালে টিপে টিপে যন্ত্রণা জয় নিচ্ছে। কেন? হাঁস? না পাগল মানুষটাকে আসতে দেখে?

ভাবনাটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করার আগেই কোমরের গেঁজের বিড়ি দেশলাই বের করে সে ধরাল। একগাল ধোঁয়া ছেড়ে গালে হাত বুলাল। খর খর করছে। কামান হয়নি। চুলটাও এর সঙ্গে কাটা দরকার। সামান্য টাকের পর কিছুটা চুল। দেরী করেই কাটে। গোল মুখটা থমথম করতে থাকল। লুঙ্গিটাকে একবার ঝাড়ল। দেখবে না দেখবে না করেও চোখ আবার গেল। পাগল মানুষটা বটে? শালা, তাগাদা আসে না!

শেষ আশ্বিনের সকাল। রৌদ্র রঙ এখনও সোনা। ধানের সবুজ সমুদ্রে শিশিরেরা রুপোলী ছাতা ধরে আছে। বাতাসে সস্নেহ স্নিগ্ধতা। শম্ভু সরকারের উত্তেজনা কিন্তু পরিষ্কার রৌদ্রতাপ অনুভব করছিল। বাতাসের ঝাপটাতেও উষ্ণতা। বিড়ি শেষ করে ছুঁড়ে ফেলল। তারপরই হাঁক পাড়ল, 'এই বদনা, পেলি?'

'না গো!' হাঁকে উত্তর করল বদনা। একখানা হাত তুলে নাড়িয়ে দিল পতাকার মত।

শালা! কিন্তু পাগল মানুষটা তো! বেটা আবার খেমে গেল। এতে সে পাগল বলে ভাবছে কোন আক্কেলে। যথার্থই পাগল কি না সে ব্যাপারে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ রয়েছে। সুশীলার ভাষাতে, খিপা। ভূত কি ঠাকুর দেবতা কিছু নয়। কাঁড় ফুঁক ঢেক হয়েছে। সেইছিল লাঙল নিয়ে। ফিরে এসেই শুয়ে পড়লেক। তারপর হি হি হাসি। হাসি থামতে একদম গুম। ক্যালক্যাল করে চেয়ে থাকে। খায়, দায়। অত চাষে মুন, তা মাঠ বাগে যায় না। কি না লাঙলের ডগাতে নাকি ঠাকুরের গা কেটে গেইছে। ঠাকুর বলেছে, আমাকে না দেখে লাঙল চালালে কেনে? আমার যে রক্ত পড়ছে। তা সেসব কথা দু'চারদিন। আসল গুতুগুস মাথায়। উর ছুটুমামা যি খিপা। কিন্তু দেড় বছর পর শ্বশুরঘর চিনে এল কি করে? সুশীলার উত্তর, ওমা খিপার আবার চিনা অচিনা রইছে। মুনে পড়েছে, এসেছে।' তা বলে একমাসে তিনবার। সুশীলার একগাল হাসি, 'তুমিও খিপা। তিনবার বোলে তিনশ বার আসতে পারে।'

যা হোক আসতে সুশীলা যত্ন আত্তি করেছে। লুঙ্গি কিনে দিয়েছে। তেল মাখিয়ে স্নান করিয়েছে। ছোট ছেলের মত খাইয়ে দিয়েছে। মানুষটা কোন

কথা বলেনি। অন্ততঃ তার সামনে। তবে মানুষটাকে দেখে, চোখের চাউনিতে ভয় ভয়াট স্বাস্থ্যে তার মনে হয়েছে, চিন্তিত, পাগল মোটেই না। সুশীলা তার জেরার স্বীকার করেছে, আগের চেয়ে ভাল। কিন্তু এও বলেছে চোখ নাচিয়ে, তুমার কুছু ভয় নাই। সুশীলারানী শম্ভু সরকারের বাঁধা। বাঁধা। কিন্তু মুখের কথাই কি সব। হলে আশ্বিনের এই স্নিগ্ধ সকালে পাগল মানুষটা সন্দেহে তার বিরক্তি জন্ম নিচ্ছে কেন।

সুশীলাকে হারানর এই যে ভয় এর নামই কি ভালবাসা। শম্ভু সরকার বুঝে উঠতে পারে না। দেড় বছরে সুশীলা তার অনেকখানি ভূমি দখল করে নিয়েছে। ওর পাগল স্বামী তক্ এটা টের পাচ্ছে। অথচ মেয়েমানুষের গা ঘেঁষেছিল নেহাতই শরীরের তাড়নায়। বড় পুকুর থেকে সুশীলার সেদিন স্নাত সুঠাম অবয়বটি ছবি হয়ে আছে। এক ঢাল কালো চুল, প্রায় কোমর ছুঁই। সুস্পষ্ট বুক, সরু কোমর, ভারী নিতম্ব। জলের রেখা জ্বালা দীঘল শরীর জুড়ে যেন তাজা জলজ উদ্ভিদের ঘ্রাণ ছড়াচ্ছিল। বড় মায়াবন মুখ আর নিবিড় চোখ। চাউনিতে কি ছুঁড়ে মেরেছিল আদিম আয়ুধ। হতে পারে। শোনা ছিল পাগল হয়ে গিয়েছে স্বামী। বাপের ঘরে ফিরে এসেছে তাই। খাটবে খাবে। সংক্ষেপে গাছতলায় কথা হল। শুধু কথা নয়। কে জানত তার মতই সুশীলার ব্যগ্র কামনাতুর শরীর ছায়াঘন সন্ধ্যাটির জন্যে এত উন্মুখ ছিল।

শম্ভু সরকার বিয়ে করেনি। কারণটা খুবই তুচ্ছ। বোলপুরের যে মেয়েটিকে তার পছন্দ হয়েছিল, সেদিনই পাকা কথা দিয়ে দেয় আর কি, সে মেয়েটি তার স্বামীত্বের অযোগ্য বলে তাকে ঘোষণা করে। কথাটা যে মামা সম্বন্ধ এনেছিল, তার মুখে শোনা। কেন-না চাষার মত দেখতে সে। অপমানটা তার পৌরুষকে যথেষ্ট আঘাত হানে। তারপর এক গোঁ বিয়ে করব না। সে মেজ। বড় সেজ ছোটর বিয়ে হয়ে গেল। মা এখনও কথাটা তোলে। কিন্তু সে গ্রাহ্য করে না। চল্লিশ হয়ে গেল। জমি জিরেত দেখে দিব্যি চলে যাচ্ছে। বড় সেজ কলকাতায় চাকরী করে। ছোটভাই রামপুরহাটে। ছোট বৌ এখানে। সপ্তাহে সপ্তাহে গাঁয়ে আসে ছোট ভাই। একান্নবর্তী পরিবারের হাওয়া অনেকখানিই বজায়। শম্ভু সরকার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রক এই পরিবারটির। সুশীলার ব্যাপারটা গোপন, কিন্তু গাঁয়ের কাকপক্ষীটিও জানে। তার পরিবার তো বটেই। তবে এ নিয়ে কোন শব্দ নেই। শম্ভু সরকারের কাজ কর্মে, কথায় বার্তায় একটা অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব আছে। স্বল্পবাক,

গম্ভীর মানুষ। গাঁয়ের হিতকর্মেও তার দান আছে। সুশীলা তিন চরিত্রের ছিল বিশেষ নেই।

'পেলাম্ না বাবু।' বদনা সামনে দাঁড়াল। খালি গায়ের কিশোর। নীল রঙের হাফপ্যান্ট। প্যান্ট বরাবর শিশির ভেজা জলে যেন পা ডুবিয়ে এল। দু'হাতও চবচবে। গোলমুখে ছোট চোখ দু'টিতে অপরাধীর চিহ্ন। ভর্ৎসনা শোনার জন্যে যেন উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে।

রৌদ্ররঙের উজ্জ্বলতা পাখপাখালি আর মানুষজনের চলাচল বাড়িয়ে দেয়। সবুজ সমুদ্রে ঠিকরে যায় সেই আলো। বড় পুকুর, ধানক্ষেতে দূরে দিগন্তরেখা বরাবর গাঢ় সবুজ রঙে এখন সুস্পষ্ট দিন।

'ওঠ, গরু বার করতে হবে। ঘর চলে যা। আর পেরেছিস্।'

শম্ভু সরকার বোঝে তার উত্তেজনাটার কেন্দ্র হারান হাঁস দু'টো নয়। পাগল মানুষটা। সুশীলার কাছে সকালেই যেতে হবে। কিন্তু হাঁস দু'টো ধরল কে? শিয়াল। হতে পারে। গাঁয়ের মানুষও অসম্ভব নয়। কেটে খেয়েছেন খবর নিতে হবে কোন ঘর থেকে মাংস রান্নার সুঘ্রাণ কাল বেরিয়েছিল। পালকগুলোরও সন্ধান করতে হবে। অতই কি বোকা। পালকগুলো নিশ্চয় পুঁতে দিয়েছে। ভাবনাটা বড় কষ্ট দেয়। সকাল থেকেই লোকসান। শম্ভু সরকারের মনে হয় আজকের দিনটা কাটবে কেমন করে।

সুশীলার কাছে বলতে ঠোঁঠ বেঁকাল ও। রাতের পান খাওয়া শুকনো লাল মোটা ঠোঁট। গায়ে আলগা হলুদ কাপড়ে কালো ডোরা বাঘিনী শাড়ী। মাথার চুল উসকো খুসকো। সাত সকালে আসতে দেখেই অবাক। হাঁসের দুঃখ শুনে ঢেউ উঠছে শরীরে হাসির। কাল রাতের এঁটো বাসন নামিয়ে সবে ঘর ঝাঁটের ব্যবস্থা করছিল। ঝাঁটা ফেলে থমকে দাঁড়িয়েছে। দিনমানে মানুষটা কম আসে। ওদিকে আতা আর আঁকড় ঝোঁপের ওপাশ থেকে দেখছে ক্ষুদে ছেলে আর বৌ ঝি'রা। লজ্জা কি!

'হাঁসের লেগে এত দুখ, ছুটে এসেছ।' সুশীলা হাসল।

হাসিটা বাসী মুখেও মিষ্টি। তবু শম্ভু সরকার বলল, 'বলিস কি, দুটো হাঁস।'

'এখনও তো বিশ ত্রিশটা আছে।'

'না, ষোলটা।' শম্ভু সরকার বলল, 'গাঁয়ের সেরা হাঁস আমার। দু'বেলা ধান দি। বদনার মা চার আনার পরে গেঁড়ি দিয়ে যায়। গাঁয়ে হাঁসের জন্য এ ব্যবস্থা কার আছে।'

'হাঁস। হাঁস। ছাড়ত। তাহলে ভাবনা কি, উর লুতে লুকের পেট থেকে আসবে। ঘরে বেয়ে বসে থাক।' সুশীলা ঝামটা দিল শরীর নাচিয়ে।

হাসল এবার শম্ভু সরকার। সুশীর শরীর ঝাঁকুনি খেলে ভারী চমৎকার সুর বের হয়।

'ঘরে বসব। চা কর।'

ভেতরে ঢুকে চটে গুছিয়ে বসল শম্ভু সরকার। বিড়ি বের করে ধরাল। জানালা নেই ঘরের। আবছা অন্ধকার দিনেও বসে থাকে। শম্ভু সরকার কথা দিয়েছে ঘর করে দেবে। হাজার দুই টাকাও তার রাখা আছে। এবারের কীতেই লাগাবে। মাটির ঘর, খড়ের চাল। তা বলে কুঁড়ে নয়।

চা দিয়ে সুশীলা কথাটা পাড়ল। কাল রাতে শম্ভু সরকার আসে নি। না এসে ভালই করেছে। তার দেওর এসেছিল। রামপুরে ঠাকুর উঠেছে। ওষুধ দিচ্ছে রোগের। অব্যর্থ ওষুধ। দাদার জন্যে বৌদিকে যেতে হবে। রামপুর তার শ্বশুরঘরের পাশের গাঁ। অন্য লোক গেলে হবে না। তাকেই ওষুধ খাওয়াতে হবে। স্ত্রীরও অনেক পালন আছে। সুশীলা না করেনি। ছাড়াছাড়ি তো হয়নি। এখনও তো মানুষটা তার স্বামী। তাছাড়া পাগল মানুষটা যদি ভাল হয়! আজ খেয়ে দেয়ে যাবে সুশীলা।

সর্বনাশা সকাল। শম্ভু সরকার ভাবল। কিন্তু কি করার আছে। মাথা ঝাঁকাল, 'বটেই ত। বটেই ত।'

সুশীলা ঠোঁট টিপে হাসল, 'মনের কথা।'

'তা বৈ কি। আহা, মানুষটা খুব কষ্ট পাচ্ছে সুশীলা!' শম্ভু সরকার দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

সুশীলা গায়ের কাপড় ঠিক করল। দু'হাত তুলে মাথার এলো চুল নিয়ে মারাত্মক ভঙ্গীতে ছুঁড়ে মারল চোখের হাসির ইশারা, 'সত্যি বলছ!'

'হুঁ।' ভ্রূ কুঁচকে তাকাল 'অসুস্থকে আরোগ্যদান মানুষের কর্তব্য।'

'ওমা। তাহলে তুমি আমাকে ভালবাস না' মাথা ঝাঁকাল সুশীলা। বলল, 'আমি কথা মনে করছি কি করে এমন চলবেক। ভেবেছি ত ওষুধ নিয়ে যাওয়ার নাই। না গেলে নয় তাই যাওয়া।'

'মাইরি!' উঠে দাঁড়াল এতে হাউইয়ের বেগে শম্ভু সরকার।

'মাইরি!' চোখ নাচাল সুশীলা।

শম্ভু সরকার হরিণীর উপর বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল। সুশীলা শুধু যন্ত্রণায়

ধ্বনি তুলল, দিনের বেলা কর কি ছাড়। আলগা গা ঢাকা দিয়ে নিজেকে তৈরী করতে সময় লাগল কিছুটা। তন্বর লোক, গাঁয়ের নামী মানুষ, কেমন আদেখলা, দুর্বল, তার হাতের পাতায় অতবড় শরীরটা বন্ধ হয় ভাবতে ভারী অহঙ্কার জাগে। এ সব সময় সে দাবড়ায়। যেন শিশু শম্ভু সরকার।

শম্ভু সরকার বলল, 'তুমি, প্রহ্লাদ সঙ্গে যাক।'

'না, একাই যেতে পারব।'

পারলেও যেতে দিচ্ছে কে। বল্লা ভেঙেছে শম্ভু সরকারের। হাত ধরল আবার। বুকের কাছে টানল। সুশীলার তীক্ষ্ণ চোখের চাউনি দেখে বলল, 'ভয় নাই, দিনের বেলা।'

'আহা চঙ্ ।

'দুয়ারট বন্ধ করে দেব।'

'ও মাগো!' ঘন হল সুশীলা।

ঘর তৈরী করার পাঁচশো টাকা এনে দিল শম্ভু সরকার। ঘরে রেখে যেতে বলল। খরচ দিল আলাদা একশ। সঙ্গে দিল প্রহ্লাদকে। বিশ্বাসী ছেলে। তার হাতের মুঠোয়। টাকা জামা কাপড় তো বটেই আশ্রয়ও দিয়েছে। মামার ঘরে পড়ে থাকত। মামা হাটিয়ে দিয়েছে। শক্তি নেই, চাষের কাজে লাগে না। ফড়িং একটা। যাত্রা করতে পারে কেবল। তাকে পুষবে কে!

রোদের রঙ চড়ল। অফুরন্ত আলো। ঘরে এসে আবার হাঁসের দুঃখ। কিন্তু বড় ম্লান। শনিবার। আজ ছোট তাই আসবে। দুপুরে বিছানা গড়াতে গড়াতে শম্ভু সরকার ভাবল, কে বলে মর্ণিং শোজ্ দে ডেজ! চমৎকার দিন। উত্তাপটা একটু কম হলে পারত। শীত আসছে অবশ্য।

বিকেলবেলায় বদনা সুখবর দিল। আঠারটা হাঁসই রয়েছে। তাহলে কি গোণার ভুল! মোটেই না। এক জোড়া হাঁস নিশ্চয়ই পাড়ার অন্য কারও হাঁসঘরে ঢুকেছিল। ভবতারণের বত্রিশটা হাঁস ওর ঘরে হতে পারে। কিংবা চিত্তদের ঘরে। বিনু পিসির ঘর হওয়াও অসম্ভব নয়। ওর আঠারটা সকালে ছাড়া পেতে পুকুরে নেমেছে। তারপর দলে চলে এসেছে। তার আসবে না কেন! দু'বেলা ধান কে দেয়। কে দেয় গেঁড়ি রোজ চার আনা করে। মেজাজটা খোশ হয়ে গেল শম্ভু সরকারের। বদনার হাসিমুখের দিকে তাকিয়ে শম্ভু সরকার আত্মপ্রত্যয়ের হাসি হাসল, 'আনি আসবে।'

'হাঁ-বাবু।'

'আরে এমন সুখ পাবে কোথা। তুই বল।'

'তা বটে।' বঞ্চনার গোপন দুঃখখানা আহ্লাদে আরও ভারী হল।

শম্ভু সরকার ভাবল, এর নামই টান। টানটা তৈরী করতে হয়।

সাতদিনের মাথায় সুশীলা না আসাতে মনে হল, টানটা কি ঠিক মত তৈরী হয়নি। কানে সোনার দুল দিয়েছে, হাতে আংটি। হার দেবে। চার চার করে আটটা ব্রোকের চুড়ি দিয়েছে। শাড়ী শায়া ব্লাউজ এটা সেটা তো আছে। উমরি ভালবাসা, আদর। হুঁ, রানী বানান। এ সুখ কি ছাড়ায়। তবু আসে না কেন। পাগল মানুষটা ভাল হয়ে গেল। ভাল হবে কি করে! সুশীলা তো সে ওষুধ ফেলে অন্য ওষুধ খাওয়াবে।

প্রহ্লাদকে আবার পাঠাল। হাঁসদু'টো পাওয়া গিয়েছে, সে খবরটাও শুনিয়ে দিতে বলল।

ফিরে এসে প্রহ্লাদ বলল, টাকা চাইছে। পাগলাটা আসে নাই। কুথা গেইছে। এলে ওষুধ খাইয়ে ইখানে আসবে।'

'হাঁসের কথা বললি!'

'হুঁ। শুনে খুব সুখ। বলল, বাবুর তুমার ভাগ্যিই ভিজ।'

কার্তিকে ধানের রঙ ধরেছে। ফসল কাটার মরসুম সুরু হয়ে গেল। শীত নামছে চুপিসাড়ে। কিন্তু মানুষের গ্রাহ্য নেই। দিনভর ব্যস্ততা। ধান আর ধান। গরুর গাড়ীতে, মাথায়, রাস্তায়, ভাঙার সোনার ফসলের ছড়াছড়ি। এবারের ফলন খুবই ভাল। চমৎকার হিসেবী বর্ষাই কারণ। ফলন ভাল হওয়ার একটাই অর্থ—সুখ। সুখ চারিদিকে।

শম্ভু সরকারের উপচান থামার। তবু দুর্ভাবনা কাটে না। কেমন যেন উয়না যে। সুশীলাকে স্বপ্নের মত মনে হয়। দু'মাসের বিয়োগ তাকে স্বচ্ছন্দে মনে করায় সে কখনও স্পর্শ করেনি নারী শরীর। তীব্র কাতরতা তার ঘুম কেড়ে নেয়। প্রহ্লাদ সেতু হয়ে থাকে। টাকা যায়। শম্ভু সরকার ভাবে, টানটা কি ঠিকমত তৈরী হয়নি! সুশীলাইবা তাকে ছেড়ে আছে কি করে! নিজে যায় না কোন ক্রমেই। কেবলই ছটফটানি ক্রিয়া করে তার মধ্যে। শীতের ছোট্ট দিনকে ভয়ঙ্কর দীর্ঘ মনে হয়। রাত্রি যেন অনন্ত বহমান। পাগল মানুষটা তো এখানে এসে থাকতে পারে। তার মনে পড়ে যায় সন্ধ্যা রাত্রির অজস্র স্মৃতি। সুশীলার শরীরের সেই উন্মাদনী গান। ভালবাসার কথা।

'তুই প্রহ্লাদ না নিয়ে আসবি না। বুঝিয়ে বলবি পাগলাটত এখানে

আসে। তুমিও চল। বাবু বলে দিয়েছে। বলবি, আমি খুব রাগ করছি। হুঁ, রাগ করেছি বলবি। না থাক, বলবি বাবুর মেজাজ খুব খারাপ।' শম্ভু সরকার যেন বাকা হাতড়ায়, 'বুঝতে পারলি গুছিয়ে গাছিয়ে এমন করে বলবি, যাতে আরেই। কি আর শেখাব।'

খামারে ধান মাড়াই হচ্ছে। পশ্চিমের সূর্য ছুঁড়ে দিয়েছে প্রশস্ত রৌদ্রকালি। বাঁশের মোড়ে বসে শম্ভু সরকার দেখে প্রহ্লাদ যাচ্ছে। ধান মাপা হয়। মনটা প্রসন্ন থাকে। সুশীলা এলে তার একগাছা গড়িয়ে দেবে। ইস্ প্রহ্লাদকে বলে দিলেই ভাল হত! হুঁ, এরকম করে, তোমায় না আসাতে বানাতে দেওয়া যাচ্ছে না। ডিজাইন দেখাবে তো তুমি।

প্রহ্লাদ বাবুর কথা অমান্য করে না। তার কেরার নাম নেই। এক, দুই, তিন। দিন যায়। শীত আঁকিয়ে বসে। ধান মাড়াইয়ের কাজের ব্যস্ততা বাড়ে। হিসাবপত্র লেনদেন, বিক্রি-বাটায় শম্ভু সরকারের জ্ঞান খাওয়ার ঠিক নেই। তবু দিনের হিসেবটি তার নির্ভুল থাকে।

অপ্রত্যাশিত সংবাদই বটে। প্রহ্লাদের মুখে নয়। অন্য লোকমুখে শম্ভু সরকার শোনে। সুশীলাকে নিয়ে পালিয়েছে প্রহ্লাদ। বজ্রপাত সরাসরি মস্তিষ্কে। জোড়া হাঁস চব্বিশটা। কিন্তু সুশীলা। সব মিলে ক' হাজার। জোড়া হাঁস ফিরে এসেছিল টানে! সুশীলা।

উঠোনে বসে শম্ভু সরকার কোমরে গোঁজা বিড়ি শেষ করে। গায়ে চাদর। আজ আবার মেঘলা আকাশ; ভারী বিষণ্ণ দিন। বস্তায় ধান বোঝাই হচ্ছে। ক'টা হাঁস ধানে মুখ লাগিয়েছে। থাক। ছোট বৌ একবার তাড়া দিল। সরে গেল ওরা।

বঙ্কিম এসে দাঁড়াল, 'বাবু আগে হাঁসের ডিম বসাব। ক'টা? কুড়িটা?'

'ডিম ক'টা আছে।'

'বাহান্নটা।'

'বাহান্নটাই।' শম্ভু সরকার উঠে দাঁড়াল। দাবড়ে উঠল, 'হাঁ করে দেখছিস কি। সব ডিমের ছা হবে। খাওয়া বন্ধ।'

বঙ্কিম সরে গেল।

আবার বসল শম্ভু সরকার। হাঁ, সারা উঠোন থৈ থৈ করবে হাঁসে, সাদা, কালোর ছিটে, সোনালী চিকন, ধূসরী, ধূসর, লালচে, হাঁস, কেবল হাঁস। এক, দুই, তিন চার। মনে মনে গুণতে থাকল শম্ভু সরকার। হাঁসগুলো তার চোখের সামনে কলকল করে বেড়াচ্ছে। ঠোঁটে হাসি এল এতক্ষণে।

অমিয় চৌধুরীর গল্প

ইস্কাবনের বিবি

বুড়ো দশরথ রোজ এসে ওদের তাশ খেলা দেখে। ওরা মানে পুষ্টু মালি, কার্তিক সাহা, ভুবন বিশ্বাস আর আমদাদু। পুষ্টু মালির ছোটখাটো চেহারা, তার ওপর আবার ফুলসার্ট পরে হাত গুটিয়ে, কাপড় পরে কিন্‌কিনে। চুল দাড়িতে পাক ধরেছে অনেকদিন আগেই, কিন্তু কলপ লাগিয়ে রং করে কুচকুচে করে রেখেছে বলে পুষ্টু মালির বয়েসও বোঝা যায় না। তেমনি বোঝা যায় না ভুবন বিশ্বাসের বয়েস। ছিপছিপে শুধু না, উচ্চতায়ও ভুবন বিশ্বাস সাধারণ মানুষের থেকে খাটো। কার্তিক সাহাকে সে তুলনায় বুড়ো দেখায় অনেক। বয়েসের খবরদারি তো আছেই, সেই সঙ্গে আছে সংসারের রকমারি ঝুট, ঝামেলা। সংসারের অশান্তি। আর একজন আমদাদু। আমদাদুর আসল নাম অরক্ষক কর্মকার। এককালে ওদের বিশাল আমবাগান ছিল নদীর ধারে। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে তার ঘর ভর্তি আম থাকত। সেই আম সে বিলি করত পাড়া-পড়শি, আত্মীয় স্বজনকে। ছেলেপুলে নেই। বাপের সম্পত্তির শরিক চারজন। চার ভাগের এক ভাগ পেয়েছে আমদাদু। কাজ-কম্ম কিছু করে না বলে সম্পত্তির আধখানা চলে গেছে পেটেই। সেই আমদাদুর ঢিলেঢালা শরীর বয়েসের ভারে স্থবির হলেও চোখের দৃষ্টিতে এখনো তেজ আছে। বিনা চশমাতেই কেমন কাগজ পড়তে পারে। তাশ খেলতে পারে।

এই গ্রীষ্মের দুপুরে সামনে গুলুবাবুদের বারান্দায় ওরা তাশ খেলতে সুরু করে বেলা তিনটে নাগাদ। গুলুবাবুদের সামনে দিকের বারান্দাটা বেশ নির্জন, ঠাণ্ডাও। বিশেষ লোকজন কেউ নেই। গুলুবাবুর বড় ছেলে বিক্রমার পি এ, কলকাতায় থাকে বৌ-ছেলে মেয়ে নিয়ে। গুলুবাবুর ছোট ছেলে কলকাতা হাইকোর্টে প্র্যাক্টিস্ করে তার বৌ-ছেলেমেয়েও কলকাতায়। এখানে থাকে গুলুবাবুর এক পাগ্‌লি গোছের মেয়ে। বিয়ে হয়েছিল মেয়ের। একটা মেয়ে হওয়ার পর কী যে হল মাথায়, স্বামী তাকে রেখে গেল বাপের কাছে। বাপ মারা গেছে অনেকদিন। কিন্তু ভাইরা তাকে তাড়ায়নি। লোকজন কম বলেই জায়গাটা নির্জন। সেইখানে তাশ খেলে ওরা।

ওরা যখন খেলতে বসে, বুড়ো দশরথ গিয়ে রোজ বসে ওদের পাশে। পুরোনো আমলের লোক সব। ব্রিজ-ট্রিজ খেলে না। ওরা খেলে টুয়েন্টি নাইন। আমদাদুর পার্টনার ভুবন বিশ্বাস, আর কার্তিক সাহার পুষ্পমালি। আমদাদুর ভাগ্য ভাল বলেই বোধ হয় তাশও ভাল আসে ওর হাতেই।

একটি সেট্ হলেই আমদাদুর মুখ ঝলমলিয়ে ওঠে। দশরথ ঘাড় নাড়ে। বুড়ো দশরথের চোখের তেজ কমেছে, তবু আঁশটে চোখে সে আমদাদুর খুশী-খুশী ভাব লক্ষ্য করে। ছেলেপুলে নেই বলে আমদাদুর সংসারও নির্বিঘ্ন। সেই নির্বিঘ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে দশরথ ভাবে, রাজ্যের যত অশান্তির বোঝা কি দশরথের কাঁধেই পড়েছে। দশরথ মনে ভাবে, মুখে কিছু বলে না।

'কই হে দাও, একটি বিড়ি দাও—' তাশ বিলুতে বিলুতে পুষ্পমালি হয়ত কখনো ঘাড়টা একটু তুলে দশরথের দিকে তাকিয়ে বলে।

ইজেরের পকেট থেকে বিড়ি দেশালাই বের করে পুষ্পমালির হাতে দিয়ে দশরথ বলে, হ্যাঁ বিড়ি খাও, বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দাও—হারছো তো খুব—'

'হারবো না, হারবো না, ও একটা সেট্ এক্ষুনি তুলে দিচ্ছি, ভাখো না।'

'উঁ ভারি মজা রে। আমরা বুঝি ভ্যারেণ্ডা ভাজতে বসে আছি এখানে!' ভুবন বিশ্বাস আবার টিপ্পনি কাটে, 'সেট্ তুলবে। অতো সোজা না!'

'ভাখো কেন, একটু অপেক্ষা করো, তাহলেই বুঝতে পারবে।' পুষ্পমালির পার্টনার কার্তিক সাহা না হেসে কথা বলে।

উত্তর দেয় আমদাদু, 'শোধ দিতে গিয়ে কালকের মত তিনটে সেট্ খেয়ে বাড়ী যাবে না তো।'

'কাল তো তোমরা চুরি করেছিলে।'

'ইস। মজা আর কি। নিজেরা খেলতে জানে না, আবার বলে কিনা আমরা চুরি করেছি।'

'অ্যাঁ কি বললে, খেলতে জানি না।'

'জানোই না তো।'

'তুই ভারি জানিস্—'

'এ্যাই খবরদার, তুই-তু-কারি করবি না—'

এমনি করে সুরু হয়। শেষ পর্যন্ত দু-একদিন হাতাহাতি হবার উপক্রম হয়। দু পক্ষই মারমূর্তি ধরে। কার্তিক সাহার মেজাজ তিরিক্ষি। তার ওপর দিন কয়েক অজীর্ণ আর অনিদ্রা রোগে ভোগার পর সব সময়-যেন রুখেই থাকে।

কথা কাটাকাটি যখন চরমে ওঠে, সে তখন হাত গুটিয়ে ঘুষি পাকায়, বড় বড় চোখে আগুন ঝরে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই, আমদাদু যখন সেই অবসরে উঠে দাঁড়ায়, পাছার ধুলো ঝাড়ে, আর রাগতভাবে বলে, 'নাঃ, এর পরে আর খেলা যায় না।', সঙ্গে সঙ্গে যেন জোঁকের মুখে নুন পড়ে। সব ঠাণ্ডা।

দশরথ হাসে আর মজা দেখে। অলক্ষ্যে নখ বাজায়। ওরা যখন ঝগড়া করে, পরস্পর পরস্পরকে গাল মন্দ দেয়, মারামারি করতে উদ্যত হয়, দশরথ তখন মনে মনে ভাবে, লেগে যা তোরা, শালারা রক্তারক্তি কর কাটাকাটি কর, অশান্তি শালা আমি একা ভোগ করি কেন, তোরাও কর। ভাবে বটে, কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্যই, পরক্ষণেই তার মনে হয়, এটা তার ভাবা উচিত না। দুঃখ ওদেরও আছে, ঐ আমদাদু, ওকে দেখে মনে হয়, ও খুব সুখে আছে, ছেলেপুলে নেই, নিবিঘ্ন জীবন, কিন্তু ঐ লোকটা যখন বাজার থেকে কৌটো ভর্তি লজেন্স নিয়ে এসে পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বিলোয়, তখন ওর মুখের দিকে তাকালে দেখা যাবে, বিষণ্ণ আর কালচে একটা ছায়া ওর বুড়োটে জীর্ণ মুখের ওপর করুণ ভাবে লতিয়ে আছে। হুঁ, ঐ এক স্বভাব দশরথের, টাকার একটা পিঠ দেখে তার মন ভরেনা, দুটো পিঠ না দেখলে মন জুড়োয় না।

দশরথ রোজ দুপুরটা কাটায় ওদের খেলা দেখে। তারপর আলো সরে যখন অন্ধকার নামে ধূসর ডানায় ভর করে, যখন ওরা খেলা শেষ করে খেলার কথাই বলতে বলতে পাততাড়ি গুটিয়ে চলে যায় যে যার ঘরে, দশরথ তখন চুপ করে দাঁড়িয়ে গুলুবাবুদের ইন্দারার পাশে কদম গাছটার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে। তখনো পাতাভর্তি গাছের ডালে ডালে বড় বড় বাদুর ডালে পা সেঁটে নীচের দিকে মুখ করে ডানা ছড়িয়ে ঝোলে। সেই সময় ওর একবার মনেও হয়, সেও বোধ হয় সংসার বৃক্ষে এমনি করে ঝুলছে।

নইলে সংসারে এত অশান্তি কেন?

'কি গো দশরথ, বলি এখানে এই সন্ধ্যে বেলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি করছ?'

দশরথ কদমগাছ থেকে চোখ নামিয়ে বক্তার দিকে তাকায়, 'ওই, ভবসিন্ধু যে, কবে এলে কলকাতা থেকে?'

'কাল এসেছি, তারপর আছো কেমন?' ভবসিন্ধুবাবু লাঠি ঠুকে ঠুকে আর একটু এগিয়ে দশরথের কাছে এসে দাঁড়ায়। ইতিমধ্যে রাস্তার লাইট জ্বলে যায়। গুলুবাবুর বাড়ীর সামনের লাইটটাও জ্বলে ওঠে। তারই আলোয় দশরথ

ভবসিন্ধুকে দেখে। ভবসিন্ধুবাবুর বয়েস আশী পেরিয়ে গেছে, কিন্তু এই বয়েসেও কেমন চলতে ফিরতে পারে। দশরথ বলে, 'থাকব আর কেমন ভাই, সংসারে নানা অশান্তি……'

ভবসিন্ধুবাবু খুক খুক করে হাসে, 'হ্যাঁ—সংসার অশান্তিময়—'

'তোমার সংসারেও অশান্তি ?'

'অশান্তি কার সংসারে নেই, বলো।'

দশরথ ঘাড় দোলায়। ভবসিন্ধুবাবু বলে ; 'এখন চলি, পরে তোমার বাড়ী যাবো,—'

ভবসিন্ধু সামনের পথ ধরে এগিয়ে গেলে দশরথ পুনরায় ঘাড় দোলায়। তারপর সেও হাঁটতে থাকে বিপরীত রাস্তা ধরে। হাঁটতে হাঁটতে ভাবে, হুঁ, ভবসিন্ধুর সংসারেও অশান্তি। অথচ ভবসিন্ধুর সংসারে তো অশান্তি থাকার কথা না। ভবসিন্ধু দশরথের মত কেরানী ছিল না। রীতিমত পুলিশ অফিসার ছিল। সরকারী-বেসরকারী নানা উৎস থেকে দুহাতে টাকা লুটে এখন রিটায়ার করে সে প্রায় কোটিপতি। সহরের পশ্চিমদিকে একখানা বাড়ী করেছে, দেখবার মত। কিন্তু টাকা দিয়ে কি সুখ কেনা যায় ? সুখ হয়ত কেনা যায়, কিন্তু শান্তি তো কেনা যায় না। তবে কথায় আছে না, পাপের টাকা টেঁকে না। ভবসিন্ধু পুলিশ অফিসার ছিল। টাকা খেয়ে জলজ্যান্ত খুনীকে ছেড়ে দিয়েছে, মানুষজনকে নিঃস্ব করে চুরি করেছে এমন চোরও ওর পকেটে টাকা গুঁজে দিয়ে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে দিনমানে, তার ওপর এ্যাডাল্টারেশন, ব্ল্যাক মার্কেটিং, ওয়াগন-ব্রেকিং, ইত্যাদি ব্যাপারে জড়িত মানুষদের কাছ থেকে মাসিক, পাক্ষিক, ত্রৈমাসিক বরাদ্দ তো আছেই। সবই তো অন্যায়ের টাকা। এত অন্যায় সহ্য হয়। ভগবানও তেমনি ধেঁতলে দিয়েছেন ওর সব আশা-ভরসায়। একটি মাত্র ছেলে, তিরিশ বছর বয়েস হল, দুটো পা তার এমনভাবে পঙ্গু যে উঠে বসতে পর্যন্ত পারে না। দিনরাত শুয়ে থাকে বিছানায়। রোজ ওর পেছনে ওষুধে খরচ হয় দুশো করে টাকা। এই সংসারে তার দারুণ অশান্তি।

দশরথ ভবসিন্ধুর কথা থেকে নিজের কথায় আসে। ভবসিন্ধু জীবনভর অন্যায় করেছে, তাই তার জীবনে অশান্তি, এ ব্যাখ্যা যদি সত্যি হয়, তাহলে সেতো অন্যায়-টন্যায় বড় একটা করেনি বা করে না, তাহলে তার জীবনে এত অশান্তি কেন ? দশরথের আবার মনে হয়, ওরা তাশ খেলছে দুপুর ভর। পুচু মালি—কার্তিক সাহা—ভুবন বিশ্বাস—আমদাদু।

ওরা নিজেদের মধ্যেই কথা বলছে।

'এই দিলাম গোলাম—তিন পয়েন্ট্।'

'আমি দিলাম নয়—দু পয়েন্ট ছ্কা—'

'এই টেক্কা—আরও এক পয়েন্ট—'

'আমার দশি-তেও তাই।'

'ইস্, শালা এক পয়েন্টের জন্যে খেলাটা হল না।'

'শালা বলছো কাকে হে, তোমার শালা গত বছর বিলে উঠেছে।'

'এ হল গিয়ে বিরক্তি অর্থে শালা।'

'কিসের খেলা? চিড়িতনের? নেই, রং দেখাও—ইস্ হরতন রং—সাব্বাস ভায়া— এ্যাই নাও, পিট্টা দাও তো, ভায়া।'

কে খেলছে, কে হারছে। রং পাচ্ছে কেউ, কেউ রং-শূন্য হাত নিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখছে। হারবে, নাকি জিতবে। খেলতে খেলতে বিড়ি ফুঁকছে। নাক মুছছে হাতের তালু দিয়ে। হাতের তালু দিয়ে মাথায় হাত বুলোচ্ছে। ভীষণ ভাবনা। তাশ খেলায় হারজিৎ আছে। হারলে লজ্জা, জিততে পারলে বুক ফুলে ঢাক। ওরা টুয়েন্টি নাইন খেলে। একদিন ব্রে খেলছিল ওরা। ইস্কাবনের বিবি গাধার ডাক-ডাকাচ্ছিল। কথাটা ভেবে দশরথ আপন মনেই হাসে।

দশরথের মাথায় আজকাল অদ্ভুত অদ্ভুত ভাবনা আসে। কালও দুপুরে এসে দশরথ ওদের খেলা দেখছিল। দেখতে দেখতে তার মনে হচ্ছিল হরতনের বিবিটা একদিন তাকে গাধা বানাতে গিয়েও পারেনি, তাকে গাধা বানিয়ে ছিল ইস্কাবনের বিবি। হুঁ, সে আজ অনেক দিনের কথা। তা বছর তিরিশেক তো নিশ্চয়ই। সেই বছরই তো হেঁকে-ডেকে, মাঝরাতের ঘুম ভাঙিয়ে কারা যেন বলে গেছিল, দেশ স্বাধীন হয়েছে, সুতরাং দুহাত তুলে গৌরাঙ্গের মত নৃত্য কর। তা নৃত্যই তো করছে দশরথ, ইস্কাবনের বিবি তাকে নাচাচ্ছে। হরতনের বিবি পগার পার। স্বপ্নটা কেমন যেন? হরতনের বিবি ছড়িয়ে আছে রাস্তাঘাটে, ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের লড়াই-এ ক্ষরিত রক্তে। কারা যেন ভেবেছিল, এত রক্তপাত, বিশ্বের কাণ্ডারী কি কখন না শুধে থাকতে পারে? কী বেঁধটে গেল বাপ! হরতনের রক্ত, মূল্য উধাও, লেংড়ী কুকুরের মত ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে পগার পার! আরো ভাবো কেন, ইস্কাবনের বিবি কেমন রাজ্যপাট বিছিয়ে বসে আছে। যেদিকে তাকাও, সব দিকেই ইস্কাবনের বিবি কেমন শূর্পনখার মত হাসছে ভাবো না।

এইসব উদ্ভট ব্যাপারগুলো আজকাল তুব্‌ড়ির মত ছুটছাই, স্‌র্‌-র্‌-র্‌ করে ফোটে, জ্বলে। বুকের মধ্যে। তারই শব্দ নাকি? দশরথ একবার আকাশের দিকে তাকায়, ধীর মন্থর গতিতে একটা বুড়ো সাতকাল গিয়ে এককালে ঠেকা এরোপ্লেন উড়ে যায় আকাশে মেঘের ভেতর দিয়ে। তার বুড়ো ধাতব শব্দ মেঘ ভেদ করে বাতাসে বাতাসে ছুটে আসে নীচে। নীচে কর্পোরেশনের বুড়ো ষাঁড় খটাং খটাং আওয়াজ তুলে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে ময়লার গাড়ী টানে—

সংসারে দারুণ অশান্তি।

'তুমি প্রভিডেণ্ড্‌ ফাণ্ডের টাকা পেয়েছিলে, তার থেকে পাঁচ হাজার তো আমাকে দিতে পারো, আমার প্রতিও তো তোমার কর্তব্য আছে।'

'প্রভিডেণ্ড্‌ ফাণ্ডের টাকায় লীলার বিয়ে হল, সেটা কি তুমি জান না বাবা?'

'রাবিশ। লীলার বিয়ের পেছনে অত টাকা খরচা করার কোন মানে হয়। তোমার যত সব ইডিয়টিক প্ল্যান।'

'তাহলে কি করে বিয়েটা হত শুনি।'

'কেন আজকাল তো লভ ম্যারেজ হামেশাই হচ্ছে—লীলাকে পারমিশন্‌ দিলেই পারতে—একটা ছেলে জুটিয়ে কোর্টে গিয়ে রেজিস্ট্রি করে নিত।'

'তার রিস্ক্‌ আছে—তাছাড়া—তুমি কি ভাবো—'

'আমি যা ভাবি, তা প্র্যাক্‌টিক্যাল—'

'আমরা পুরোনো মানুষ।'

'তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গিও তাই পুরোনো।'

'অস্বীকার করছি না।'

'যাই হোক্‌, তাহলে মাকে বলো সে একটা টিপসই দিয়ে দিক্‌, তাহলে যে চারবিঘে জমি আছে দুরজপুরে, সেটা বিক্রি করেও পাঁচ হাজার টাকা পেয়ে যাই।'

'পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে কি করবে—

'ব্যবসা।'

হুঁ, ব্যবসা করেছে দশরথের একমাত্র ছেলে। ইস্কাবনের বিবি। ছেলে তার ধরমতলার মোড়ে জুয়েলারীর দোকান দিয়েছে। ঝক্‌মকে দোকানে কাঁচের শো-কেসে চকচকে রূপোর অলঙ্কার শোভা পায়। রাতের অন্ধকারে পাত্তির বোঝায় পুলিশকে গাধা বানিয়ে ইস্কাবনের বিবির সন্তানেরা আসে ভদ্রলোক সেজে। চোরাই সোনা ছ'কড়া ন'কড়ায় দিয়ে যায়। আর ছেলে তার আতরের গন্ধে

তরপুর পাঞ্জাবী-ধুতি উড়িয়ে বাবুটি সেজে লোকের অন্তরঙ্গ হয়, কথার কৌশলে লোকের ঘরের হাঁড়ির খবর বের করে চোরকে জানায় পথ। তারপর কোন এক সকালে শোনা যায় লোকের বাড়ী চুরি হয়ে গেছে। অথচ লোকে বুঝতেও পারে না, তাদের ঘরের অলঙ্কার সোনার তাল হয়ে ততক্ষণে জমে গেছে ছেলের আয়রন চেস্টে।

হুঁ, ইস্কাবনের বিবি চিক্‌চিকিয়ে হাসে।

নাঃ কী যে ভাবে দশরথ দিনরাত।

দশরথ ঠুকুরঠুকুর্ করে পথ হাঁটে। সন্ধ্যে হল বুঝি? সেই বেরিয়েছে ঘর থেকে, তখন চড়া রোদে আকাশ পুড়ছে। এখন রাতের সুরু। রাত মানেই বেরাত। অন্ধকার। কষ্ট। দুঃখ। মন খারাপ। ফোঁস্ ফোঁস্ দীর্ঘশ্বাস। খক্ খক্ কাশি। থু থু থুতু ফেলা। গলার কাছে খুস্ খুস্।

'হ্যা গা, এখনো ঘুমুলে না?'

'না গো ঘুম আসছে না আমার—'

'কিন্তু এভাবে—'

'সন্তুটা যে কোথায় গেল।'

'খোঁজ তো নিয়েছি অনেক।'

'দেশে কি পুলিশ-টুলিশ নেই—আমার জলজ্যান্ত ছেলেটা হারিয়ে গেল—'

'পুলিশ তো হারানো ছেলে খুঁজে দেবার জন্যে নয় সন্তুর মা, পুলিশ হল গিয়ে থাকা ছেলে হারিয়ে দেবার জন্যে।'

না, কিছুতেই থামতে চায় না সন্তুর মা। ছ'বছর নাকি। তাই-ই হবে বোধ হয়। হিসেবে আজকাল বড় ভুল হয়ে যায় দশরথের। ছ'বছর না আট বছর আগে জোয়ান ছেলেটা রাত ন'টায় বন্ধুদের সঙ্গে সেই যে বেরিয়ে গেল 'আসছি' বলে, তা এতদিনেও তার কাজ শেষ হল না। বড্ড কাঁদে দশরথের স্ত্রী মলিনা। রাতভর জেগে থাকে, কাঁদে, চুপচাপ বসে পাগলের মত। খোলা জানলা দিয়ে আকাশের ওপর শূন্য দৃষ্টি মেলে।

সংসারে বড় অশান্তি। হাঁটতে হাঁটতে দশরথ চলে আসে দীনবন্ধু পার্কে। পার্কের ঠিক গেটের কাছেই হিন্দুস্থানী বাদামওয়ালা সামনে কেরোসিনের ডিবে জ্বেলে বসে আছে প্রতিদিনের মতই। কেরোসিনের ডিবের মোটা শিখায় গা বেয়ে কালচে কালচে ধোঁয়া উঠছে।

'কি হে, কত করে শ' বাদাম?'

'আজ্ঞে, আশী পয়সা—'

'দাও তো পঞ্চাশ।'

'ধরিয়ে বাবু—' দশরথকে দেখে হিন্দুস্তানী বাদামওয়ালা কী ভাবে কে জানে। ওর ডালার সামনে জংলী প্রিন্টের শাড়ী-পরা একটি বিনুনী-কোলান তরুণীর হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে এক সুদর্শন যুবক। তারাও বাদাম কিনবে। কিন্তু বৃদ্ধের প্রতি বৃদ্ধের টান বশতই হোক অথবা বুড়ো দাঁড়িয়ে থাকলে তরুণ-তরুণীর কিঞ্চিৎ অসুবিধা হতে পারে এই ভেবেই হোক, বৃদ্ধ লোলচামড়া বাদামওয়ালা পঞ্চাশ গ্রাম বাদাম ওজন করে আগে দশরথের হাতে দিয়ে দাম নেয়, তারপর ওদের দিকে মন দেয়।

রামদাসের ঠোঙা হাতে নিয়ে এসে পার্কের একপাশে একটা জমকালো নাতি-উচ্চ রাধচূড়ার নীচে লোহার বেঞ্চিতে বসে। সংসারে বড় অশান্তি। কী যে হয়েছে আজকাল। দশরথ একটি বাদাম ছাড়িয়ে মুখে দিতে গেলে তার বুকটা কেমন করে যেন কেঁপে যায়। তাই তো। দশরথ বুড়ো হয়ে গেছে। দাঁতগুলো প্রায় সব ক'টিই একটি করে পড়ে গেছে। দশরথ তো বাদাম চিবিয়ে খেতে পারে না। তাহলে সে পয়সা খরচ করে বাদাম কিনল কেন। সংসারে বড় অশান্তি। দশরথ বাদাম চোষে, দন্তহীন মাড়ি দিয়ে চেপে চেপে। জিহ্বার সাহায্যে লালা দিয়ে ভিজিয়ে ভিজিয়ে। চোয়াল নেড়ে নেড়ে।

অথচ দশরথ এক সময় যুবক ছিল। সে যখন ল্যাণ্ড্ রেভিনিউ অফিসে কাজ করত তখন সে সে ভাগড়াই স্বাস্থ্যের যুবক ছিল। বাদাম খেতে ভালবাসত। লোকে পকেটে চকলেট রাখে, বিস্কুট রাখে। দশরথ রাখত পকেট ভর্তি বাদাম। এই নিয়ে ঠাট্টা করত শুকদেব পোদ্দার। অথচ সে নিজে এসে যখন তখন দশরথের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াত। বলত, 'দাও দুটো বাদাম।'

'সে কি এই একটু আগে ঠাট্টা করছিলে, আর এখন বাদাম চাইছো।'

'আরে, তাতে কী হয়েছে, তুমি হলে বন্ধু মানুষ, তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করব না তো করব কার সঙ্গে। দাও, দুটো দাও তো—শুকদেব পোদ্দার অপেক্ষা করত না। কাছে এসে দশরথের পকেটে হাত ঢুকিয়ে এক থাবলা বাদাম বের করে নিত। ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে খেত।

কোনদিন সেই সময় ওর টেবিলে এসে কেউ হয়ত দাঁড়াত। অচেনা মানুষ। সঙ্গে সঙ্গে শুকদেবের বলমলিয়ে উঠত। বাদামগুলো দশরথের টেবিলে নামিয়ে দিয়ে বলত, তুমি খাও, আমার সময় নেই। বলে অতি তৎপর হয়ে সে

নিজের টেবিলে গিয়ে বসত। বেশ নরম স্বরে ভদ্রলোককে নিজের টেবিলের সামনে বসতে বলত।

হুঁ, তারপরই সুরু হত ইস্কাবনের বিবির খেলা। ইস্কাবনের বিবিকে হাত করতে পেরেছিল বলে পেস্কার শুকদেব পোদ্দার কেরানী গিরি করেও কেমন দোতলা দালান হাঁকিয়ে ফেলেছে। ব্যাঙ্কে পোষ্টাপিসে ফিক্সট্ ডিপোজিটে মোটা অঙ্ক খলখলিয়ে হাসে।

কিন্তু সংসার অশান্তিময় দশরথের। বড্ড রাগ হয়। পদে পদে তাকে গাধা বানায় ইস্কাবনের বিবি।

'ওসব নীতি-কিতি বাদ দাও ভায়া, আপনি বাঁচলে বাপের নাম।'

'তুমিও বাঁচবে না, বাপের নামও ভুলবে।'

'তাহলে কলা চোষো—'

'কলা কেউ চোষে না—'

'চোষে—যারা বাপের জন্মে কলা খায়নি, তারা কলা নিয়েই চুষতে সুরু করে দেয়।'

'আমি কি কলা খাইনি ভাবছো—'

'কলা না খেলে অমনি অবস্থা হয় তোমার।'

তা সত্যি। দশরথ জীবনভর কলার চাষ করছে। দশরথ ভেতরে ভেতরে মরেছে। বাপের নামটা ভোলেনি, তবে ভোলার মতই। নইলে বাপের নাম যার ধনকেষ্ট তার কেন বারে বারে মনে হয়, ধনের কেষ্ট। কেষ্ট তো ধনেরই। নইলে ইস্কাবনের বিবির গায়ে হাত ছোঁয়ান অপরাধ জ্ঞান করে ধন থেকে দূরে থাকার ইস্কাবনের বিবি তাকে এমন করে গাধা বানাচ্ছে কেন।

নাঃ, কাঁহাতক আর বসে থাকা যায় এখানে। খানিকক্ষণ বসে থাকলেই পা নিস্‌পিস্ নিস্‌পিস্ করে। আবার হনহনিয়ে হাঁটবে, তারও তো উপায় নেই। বুড়ো হাড়ে কাঁহাতক আর হাঁটা যায়। অশান্তি সব দিক থেকেই। মাথার কাছে একটা মশা ঘুরছিল। মাঝে মাঝে দশরথের নাকে এসে বসছিল। কিন্তু হুল ফুটোবার আগেই তার তৎপর হাত তাড়িয়ে দিচ্ছিল।

দশরথ এবার উঠে দাঁড়াল। সামনেই জলের ধারে আর একটা বুড়ো মাথা-মোটা লাঠিটা রেখে জলের ধারে তাকিয়ে বসে একমনে সিগারেট টানছিল। ওকে সিগারেট টানতে দেখে দশরথেরও ধূমপানের ইচ্ছা চাগিয়ে উঠল। হুঁ, অনেকক্ষণ হয়ে গেল দশরথ বিড়ি খায়নি। বিড়ির খোঁজে দশরথ পিট-ছেঁড়া পাঞ্জাবীর ডান

পকেটে হাত ঢুকোল। না, ও পকেটে বিড়ি নেই। বাম পকেটে হাত ঢুকোল। না, বাম পকেটেও নেই। অথচ বিড়ি একটা না খেলে ভাল লাগছে না।

মিনিট কয়েক সেই ধূমপানরত বুড়োর দিকে তাকিয়ে দশরথের মনে হল, না বিড়ি না, আজকের মত একটা সিগারেটই খাওয়া যাক না। একটা দিনই তো। মাঝে মাঝে দু-এক পয়সা বাজে খরচ করতে মন্দ লাগে না। বাজে জিনিষেরও দাম আছে। দশরথের আবার মনে হয়, কারা তাশ খেলছে। টুয়েন্টি নাইন্। গোলাম-চোদ্দ-টেক্কা-দশ ছাড়া বাকী সব তাশই তো কাল্তু। কাল্তুগুলো নাহলে খেলাও হয় না।

'আমার হাতে চারটে গোলাম—আমাকে কে হারায়।' রসিয়ে রসিয়ে কে যেন বলছে কথাগুলো। হুঁ, যার হাতে গোলাম, তারই জিৎ। গোলামের দাম অনেক। দশরথের মামা হুতোমপুরের রাজার গোলাম ছিল। রাজার মন রাখতে প্রজা পিটুত বেদম, লোকের ঘরের চালায় আগুন লাগিয়ে হুতোমপুরের রাজকন্যাকে চমৎকার দৃশ্য দেখাত। কুকুরের মত ল্যাজ নাড়ত। সেই মামা যখন মারা যায় তখন দুশো বিঘে সম্পত্তি রেখে যায়। মামার দাম ছিল।

'দাও তো একটা উইল্স—

দশরথ পার্কের সামনে পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে গোলগাল চেহারার পানওয়ালাকে কথাগুলো বলে বুক পকেট থেকে মানি ব্যাগটা বের করে। বোতাম খুলে হাত ঢুকিয়ে দেখে, দশটি পয়সা ছাড়া ওতে আর কিছু নেই। থাকার কথা না। পেন্সনের যে কটা টাকা পায়—

'একটা না, এক প্যাকেট দেব বাবু?'

'একটা—বললাম তো, একটা—' দশরথের হঠাৎ ফাঁকা মেজাজ নিতে ইচ্ছে করল। কেউ বিনীতভাবে কথা বললে ওর তখন মনে হয়, সে খুব ইম্পর্টেন্ট্ মানুষ। মেজাজ নিতে ইচ্ছে করে।

পানওয়ালা প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে দশরথের হাতে দেয়। দশটা পয়সা দিলেই যে দশরথের ব্যাগ গড়ের মাঠ হয়ে যায়, তাকি আর পান-ওয়ালা জানে? আর জানবেই বা কেন ভাবে দশরথ। নিজের দারিদ্র্যের কথা হেঁকে-ডেকে লোক জানিয়ে ঘোষণা করার মধ্যে কোন মহত্ব নেই। দশরথ তাই পয়সাটা পানওয়ালার হাতে দিয়ে সিগারেট নেয়। এবং যেন এখনো ওর ব্যাগে মোটা মালকড়ি আছে এমনিভাবে নিয়ে ব্যাগের বোতাম আটকে বুক পকেটে রাখে।

তারপর দোকানের দড়ির আগুনে সিগারেট ধরিয়ে সামনের দিকে হাঁটে।

কিন্তু অন্ধকার গলিতে ঢুকতেই, কে যেন ছুটতে ছুটতে এসে ধাক্কা মারে দশরথকে।

টাল সামলাতে না পেরে ধপ্ করে বসে পড়ে মাটিতে। ভয়চকিত, আতঙ্কিত দশরথ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে, যে যুবকটা তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে গেল, সে ততক্ষণে ছুটতে ছুটতে অনেক দূরে এগিয়ে গেছে। পাছায় লেগেছে খুব। তবু কিংকর্তব্যবিমূঢ় দশরথ উঠে দাঁড়ায়। পাছার ধুলো ঝাড়ে। মুখ থেকে সিগারেটটা ছিটকে গিয়ে রাস্তায় পড়েছে।

সিগারেটটা কুড়োতে গিয়েও রাস্তার ধারের এক দোকানদার তার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে আর কুড়োলো না।

আর তখনি তার মনে হল' বুকপকেটটা হাল্কা লাগছে। দশরথ বুক পকেটে হাত দিয়ে দেখে। পকেটে ব্যাগ নেই। খানিকটা চুপ করে থেকে ব্যাপারটা বুঝে নেয় দশরথ।

থাকতে না পেরে হঠাৎ হো হো করে হেসে ওঠে দশরথ।

আর তখনি, বিচিত্র এক অনুভূতিতে আচ্ছন্ন দশরথের মনে হয়, ইস্কাবনের কালো বিবি পুনুমালি-কাত্তিক সাহা-সাহা-ভুবন-বিশ্বাস-আমদাদুদের চাটাই থেকে উড়ে এসে ঢুকে গেছে তার বুকের মধ্যে। আর সেই ইস্কাবনের বিবি হঠাৎ সেই অপরিচিত যুবকটিকে গাধা বানিয়ে দিয়েছে।

দশরথ হাসে, হো, হো, হো···নিগে···নিগে···তুই···আমার ব্যাগ···হতচ্ছাড়া তোর খাইনিই সার···

অন্ধকার গলির মধ্যে বিকট হাসিতে ফেটে পড়া দশরথকে যেন হিম হিম আকাশ থেকে নেমে আসা কালপুরুষের মত মনে হয়।

অজিত হাজরার গল্প

ডেথ ডেথ খেলা

অবশেষে বিদ্রোহীর গলায় বিজন বলল—চুপ করে থাকলে হবে না। আমরা এই অব্যবস্থার প্রতিবাদ জানাব। আমাদের ঠাণ্ডা রক্ত গরম হল না। আমি বলি কেটে পড়লে কেমন হয়? বিজন চোখ পাকাতে অমল হাসল—ট্যারা হয়ে যাবি!

রাজধানীতে কড়া শীত পড়েছে, তার ওপর আজ রোদ নেই পিঠ পাতবার মতো। আঙুলের ডগা চিন চিন করে। ঠাণ্ডায়, উদ্বেগেও। কলেজ রুটের বাসের অব্যবস্থা নিয়ে গোলমাল চলছে। পুলিশ কখন কী করে বলা যায় না।

হেঁতুলতলায় গাবানো মুলতুবি রইল। আমরা এক ইয়ারের ক'জন কফি খেতে ক্যান্টিনে চলেছি। বেঁচে থাকার জন্য একটু উষ্ণতার প্রয়োজন।

আচমকা শঙ্করকে মনে পড়ল। পাগলা কোথায়? কেমন খালি খালি লাগে, শার্টের বোতামভাঙা জায়গায় হাত পড়লে যেমন লাগে তেমনি। বিজনকে জিজ্ঞাসা করলাম কেননা এক পাড়ায় থাকে ওরা। ও বলল—এসেছে তো।

কলেজ বাড়ির কার্নিশে একটা চড়াইয়ের লীলাখেলা ফুরিয়ে যায়। ঝপ্ করে মাটিতে পড়ল। ছুটে গিয়ে দেখি পাখিটার চোখের তারা ওলটানো, ঠোঁটের কাছে এক বিন্দু রক্ত। হাত দিয়ে ছুঁয়ে বিজন বলল—আহা বেঁচে নেই।

করিডরে মেয়েদের পশমিনা জটলা থেকে পাপিয়া আমাদের নজর করছে, চোখের সব আলো কিন্তু অমলের মুখের ওপর ফোকাস করা। ফলে, অমলের মুখ উজ্জ্বল।

অমলের কী কপাল! বাবার ফোর্ড ক্যালকনে পাপিয়াকে তুলে মাঝেমধ্যে দিব্যি হাওয়া কাটে। যমুনা পুলিনে গাড়ির স্পীডোমিটারের কাঁটা পঞ্চাশের বাঁদিকে থাকে না।

মুখ ঝুলিয়ে ধোঁয়াটে ক্যান্টিন ঘরে ঢুকলাম। একটু আগে এখানে অনেক ছাত্রছাত্রী জমায়েত হয়েছিল। ভীষণ বচসা হয়েছিল লাইন অফ অ্যাকশন নিয়ে। এখন শুধু ছড়ানো ছিটনো সিগারেটের টুকরো আর প্যাকেট-প্যাকেট ধোঁয়া।

থমকে দাঁড়ালাম। কোল্ডিং চেয়ারে বসে শঙ্কর নিবিষ্ট মনে ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছে। পায়ের কাছে খানিকটা লাল দাগ। আমরা বললাম—রক্ত। শঙ্কর বলল—কিছু না।

শঙ্করের পাথর চাপা কপাল। হারার দেকেণ্ডারীতে অনেক নম্বর পেয়েও স্কলারশিপ পেল না মাত্র সাত নম্বরের জন্যে। হালকিল বেচারা এইরকম আর একটা দাগা পেয়েছে।

বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কী ওর খেয়াল, লটারির এক টাকার টিকেট, পঞ্চাশ পয়সায় বিক্রী হচ্ছে শুনে কিনে ফেলল একটা। তারপর পাঁচ সেন্টিমিটার ঠোঁট ছড়াল—না পেলে আর্ধেক ক্ষতি, পেলে ডবল লাভ।

ড্রয়ের পর ওকে যত জিজ্ঞেস করি, কী হল, ততই গম্ভীর হয়। শেষমেষ জানতে পারলাম, এক হাজার টাকার যাকে বলে সান্ত্বনা পুরস্কার, তাই পেয়েছে। কিন্তু এক লাখ পেতে পারতো।

সেই থেকে শঙ্করের মনে সুখ নেই। একা একা থাকে। ক্যান্টিনে ঘাড় গুঁজে বসে ম্যাগাজিনের বিজ্ঞাপন পড়ে, রক্ত দেখে বলে—কিছু না।

অমল বলল—কী স্টাডি করছিস?

বিজন শঙ্করের পেছনে দাঁড়িয়ে, আওয়াজ দিল—ফ্রেয়ার দেখছে। টাকা ক'টা ফুস্ না হওয়া পর্যন্ত দেখবে।

ঘাড় ঘুরিয়ে শঙ্কর তির্যক চোখে বিজনের দিকে তাকাল। কোন মন্তব্য করল না।

অমল বলল—দেখুক। তোর মত সবাই কিছু মাও সে তুং নয়, যে ছাতার কাপড়ের কোট পরবে।

ঝগড়ার কথা আমার ভাল লাগে না। শঙ্করের উরুতে হাত রাখি—কবে খাওয়াচ্ছিস্ আমাদের?

—আগামী রবিবার। কাসানোভায়। শঙ্কর পাগলের মত হাসল—পান-ভোজনের পর ডেথ ডেথ খেলা। বুঝলি?

ভয় পেয়ে যাই।

বিজন কাউন্টার থেকে চারকাপ কফি নিয়ে এল। গোল হয়ে বসলে ও বলল—শহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে কলেজ। বাস ছাড়া গতি নেই। কর্তৃপক্ষকে এই রুটে আরও বাসের জন্য ডি, টি, ইউকে লিখতে হবে। গা বাঁচিয়ে চললে হবে না।

অমল চুপ করে রইল। ও বাবার গাড়িতে না হলে ট্যাক্সিতে আসে। বাসের ওপর নির্ভরশীল নয়।

আমি বলি—কদিন আর ট্যাক্সি করে আসব? বাস চাইই। তবে—

—তবে কী ? শঙ্কর আর বিজন দুজনই আমার মুখের দিকে তাকাল।

ভয়ে ভয়ে বলি—এই নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঝগড়া করবি ?

শঙ্কর বলল—ঝগড়া আমরা করছি না।

আর বিজন বলল—ঝগড়া হয় হবে, সমস্যার সমাধান চাইই।

শঙ্কর আর বিজনের বচসা লেগে গেল। আমি শঙ্করকে চেপে ধরি—চুপ দে। কফি খা।

কাপে চুমুক দিতে ওর মুখের স্বাভাবিক রক্ত ফিরে এল। তখন হেসে বললাম —ওই খেলাটা কী রকম রে ?

—দেখতে পাবি।

এই বলে শঙ্কর বিড়বিড় করে। এখনও রাগ যায় নি।

অমল হাত দিয়ে শঙ্করের চেকনাই কাইভপীসের কলারটা নাড়ছিল, বলে— কত খসালি।

—শ খানেক। একটা টেরিউলের ট্রাউজার্স বানিয়েছি। শঙ্কর পা নাচাল —আর এই জুতো জোড়া।

ওকে খুশী করার জন্যে ব্লাশ্টহেড জুতোর তারিফ করলাম। ও বড়গলায় বলল—মেজেস্টিক হয়েছে ট্রাউজার্সটা। অনেকটা অমলের মতন।

—তবে আর কী। অমল ফুট কাটল। এবার স্যুটেড বুটেড ফুট ফুটেড হয়ে কলেজে আসবি।

শঙ্কর শব্দ করে হাসে।

কফি খাওয়া হয়ে গেলে বিজন চলে গেল। কলেজের আওতায় পুলিশি জুলুমের প্রতিবাদে মিটিং হবে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও ব্যাপারটার দিকে মনোযোগ দিতে পারছি না ; কেবলই ওই খেলাটা মাথার ভেতর নড়াচড়া করে। থাকতে পারলাম না, নীচুগলায় শঙ্করকে জিজ্ঞেস করি—চুটিয়ে ফুর্তি করবি, তাই না ?

ফুর্তির কথা অমল ঠিক শুনতে পায়। হেসে বলল—তাই। আমরা মদ খেয়ে বেহেড হয়ে যাব। ফোর্ড ক্যালকানে হাওয়া কাটব। চারজনে চারটে মেয়েকে বগলদাবা করে ঝাঁপ দেব যমুনার জলে।

শঙ্কর হাততালি দেয়। নজরে পড়ল ওর বাঁহাতের কড়ে আঙুলের ডগা থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে। বলি—কাটল কী করে ?

তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে ও বলল—ব্লেড দিয়ে চিরেছি। দেখছিলাম কেমন লাগে।

কেঁপে উঠি।

খট্ খট্ খট্। পুলিশের ভারী বুটের শব্দ। অমল বলল—ওই এসেছে।

উঁকি মেরে দেখলাম। সাতজন কনস্টেবল একজন সাবইন্সপেক্টার। কনস্টেবলের হাতে লাঠি, সাবইন্সপেক্টারের কোমরে পিস্তল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। তারপর শঙ্কর বলে—বিজুটার মধ্যে কী আছে কে জানে।

—কী আবার থাকবে? অমল সিগারেট ধরাল।

—না, কিছু আছে। শঙ্কর আচ্ছন্নের মত বলল—ওর অবস্থা আমার চেয়েও খারাপ কিন্তু একটুও দেখে যায় নি।

আমি বললাম—এই শঙ্কর, তোর কী হয়েছে বলতো?

—জীবনে ঘেন্না ধরে গেছে। ওই ক'টা টাকার কার দুঃখ ঘুচবে বলতো? বাবার দেনা শোধ হবে। মাকে ভেলোরে পাঠাতে পারব? বিয়ে হবে দিদিটার? কিছুই হবে না। তাই ভেবেছি চুটিয়ে ফুর্তি করে নেব, যেন মরলেও দুঃখ না থাকে।

ভয়ে ভয়ে বলি—মরবি কেন?

—বাঁচবই বা কেন? শঙ্কর ম্লান হাসে—বিজনের মত আমি বিশ্বাস করিনে, পৃথিবীটা কোন দিন সুখের হবে। অত মনের জোর নেই আমার।

স্বগত বলি, মনের জোর যখন নেই—মরতে তুই পারবি না।

অমল অবাক করে দিয়ে বলল—মরতে হলে এয়ারক্র্যাশ: ইজ আইডিয়াল। উইথ পাপিয়া।

ফুর্তির গলায় শঙ্কর বলে—অমল, কাসানোভায় আমি দুএকদিন থাকব। তারপর টেলিফোন করব তোকে, তুই গাড়িটা নিয়ে চলে আসবি।

—আমাকে নিবি না? করুণ নয়নে একবার শঙ্কর একবার অমলের মুখের দিকে তাকাই।

শঙ্কর বলল—হাঁ, হাঁ, তুইও আসবি।

পানভোজনের আলোচনায় যখন নরক গুলজার বিজন ফিরে এল ক্যান্টিনে।

—কীরে। তোরা এখানে কী করছিস?

—কিছু না। আমি বলি।

—ওঠ। বলে বিজন আমার হাত ধরেছে। গুরুবচনসিং উসকো খুসকো দাড়ি উড়িয়ে ঘরে ঢুকল। অমল গলা নামিয়ে বলে—বাঁধাকপির কিছু হয়েছে।

আমি বলি—কী হ'ল পাইয়াজী? ও বলল—কাপুর ডি, টি, ইউএর বাস চালাতে গিয়ে একটা লোক মেরেছে।

—বাস চালাতে গেল কেন? জিজ্ঞেস করে বিজন।

—ভেবেছিল খুব মজা হবে। গুরুবচন জবাব করল।

—কী যে ঝামেলা করিস তোরা। বলে বিজন ছুটল, যেন সব দায় ওর।

অমল গুরুবচনকে জিজ্ঞেস করে—যে লোকটা মরেছে সে কেমন? মানে তার স্ট্যাটাস কী?

—স্ট্যাটাস নিয়ে কী হবে? গুরুবচন উলটে প্রশ্ন করল।

আমি মুখিয়ে উঠি—স্ট্যাটাসই তো সব। মনে নাই। মিনিস্টারের বেটা কভারবোলা ম্যানহোলে পড়ে পা ভাঙতে এস্টাবলিশমেন্ট দুনিয়া গাবালে, অথচ আর কদিন আগে বস্তির একটা বাচ্চা পড়ে মারা যাওয়ায় কেউ খেয়ালও করে নি। যদি লোকটা রাস্তার মানুষ হয় কাপুরের কিছু হবে না।

শঙ্কর খরগোশের মত কানখাড়া করে আমার কথা শুনছিল, বলে—এমন হতে পারে বস্তির ছেলেটা ওভাবেই সুইসাইড করেছে, যেমন এই লোকটা গাড়ির চাকায় মাথা দিয়ে করল। কতভাবেই না সুইসাইড করা যায়।

—গাব্বা। অমল কাগজ ছেঁড়া গলায় বলল—শুনছি কাপুরের মত আনাড়ী ড্রাইভ করছিল।

—তাতে কী হয়েছে? লোকটা যদি সুইসাইড করব বলে ঘর থেকে বেরিয়ে থাকে এ সুযোগ ছাড়তে পারে না। হাইজ্যাক করা বাসে চাপা পড়লে স্যুয়োর ডেথ শুধু না স্যুয়োর সেনসেশন।

আমরা হাসতে থাকি।

স্থির চোখে শঙ্কর সকলের মুখের দিকে তাকায়। তারপর গম্ভীর গলায় বলে—বিশ্বাস হচ্ছে না? তাহলে একটা রিয়াল ফ্যাক্ট বলি। কাগজে বেরিয়েছিল, পড়েছিস কিনা জানি না। আমার চোখে দেখা।...লাস্ট সামার ভ্যাকেশনে মামাবাড়ি গিয়েছিলাম। বাড়ির ঠিক পিছনেই রেল লাইন। রাত্রে ছাতে শুয়ে দেখি নটার ডাউন ট্রেন যায়। বারোটার আপ ট্রেন আসে, সেটা সবদিন দেখতে পাই না, আগেই ঘুমিয়ে পড়ি।...সেদিন চাঁদনী রাত। ফুরফুরে হাওয়া, বেল ফুলের গন্ধ, সানাইয়ের সুর। কী যে ভাল লাগছিল, তোদের বোঝাতে পারব না। লাইনের দিকে তাকিয়ে থাকি। ডাউন ট্রেন গেল। চেয়ে আছি। একটা লোক, পরণে ধবধবে পাঞ্জাবী পাজামা হাতে চাঁদির মত চকচকে একটা

কিছু, স্লিপারের ওপর বসল।...তখনই আমার বোঝা উচিত ছিল। ব্যাপারটা কিন্তু বুঝি নি। ঘুমিয়েছিলাম।...ভোরবেলায় হৈ চৈ। শুনলাম একটা লোক রেল লাইনে কাটা পড়েছে। ছুটলাম। দেখি, পাঞ্জাবী পাজামাপরা কবন্ধটা স্লিপারের ওপর চাদর পেতে দিব্যি ঘুমোচ্ছে। লাইনের ওপাড়ে চাঁদির মত চকচকে টিফিন কেরিয়ার, চ্যাপ্টা বোতল, ছুচারটে পরোটার টুকরো মাংসের হাড় আর লোকটার মাথা। পুলিশ এল। যা ভেবেছিলাম তাই। পকেট হাতড়াতে একটি চিরকুট: আমার মৃত্যুর জন্য কেহ দায়ী নহে। ফকির সুলতান হওয়ার পর—আর—

শঙ্করের যেমন স্বভাব কথা শেষ করল না। আমি উত্তেজিত গলায় জিজ্ঞেস করি—তারপর কী? ও ম্লান হাসল—তাও বলে দিতে হবে!...আর ফকির হতে পারে না।

বিজন আবার এল। বলে—মিটিং বসেছে।

আমরা উঠলাম। করিডরে শঙ্কর বলল—তোরা মিটিং করগে। আমি যাব না।

—কেন? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—যাই, বাসে চাপাপড়া লোকটাকে দেখে আসি।

শঙ্করের হাত চেপে ধরলাম। ও টানাটানি করতে বিজন বলল—ক্র্যাক-ডাক্‌টটা ছেড়ে দে।

ইউনিয়ন মিটিং-এ আলোচনা হচ্ছে, ধর্মঘট করা ঠিক হবে কিনা। অমল পাণিগ্রাহীকে ইসারা করল। একটু পরেই হাওয়া কাটল ওরা। হঠাৎ কী যে হল, দেখি পুলিশ ধরপাকড় সুরু করেছে। একজন কনস্টেবল ফাস্ট ইয়ারের জানকীর গায়ে হাত দিতে বিজন ছুটে এল আর অমনি মাথায় এক ঘা। ও ঝপ করে পড়ে গেল। ভয় পেয়ে আমি বুলেটের মত বেরিয়ে যাই।

বাস স্ট্যাণ্ডে পৌঁছতে খিদে পেয়ে গেল। বিশ পয়সার মাত্র পঞ্চাশ গ্রাম চিনাবাদাম। ধীরে ধীরে চিবোচ্ছি, যেন ফুরিয়ে না যায়। অতি দুঃখেও হাসি পেল এই ভেবে: যখন বিজন মার খেয়ে মরছে তখন, অমল পাণিগ্রাহীকে ম্যাটিনি দেখাচ্ছে, শঙ্কর ভুখোড় পাগলামি করছে আর আমি শুকনো চিনেবাদাম চিবোচ্ছি।

যদি বা একটা বাস এল—দারুণ ভিড়। উঠতে চেষ্টা করলাম, কণ্ডাক্টার পা বাড়িয়ে পথ আটকাল। কলেজ যাওয়া আসার কী যে ঝামেলা।

আজ সকালে কুয়াশা এমন ঘন যে কিছুই স্পষ্ট বোঝা যায় না। রাস্তায় রাম শ্যাম সকলে ছায়াছায়া মানুষ মাত্র।

কলেজ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ। বাড়ির বারান্দায় চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে আছি। মনটা বড় চঞ্চল। মা বলল—মিনুকে অঙ্কটা দেখিয়ে দে।

বারান্দা ছেড়ে ঘরে এলাম।

গাণিতিক সমস্যার যখন সমাধান করছি, নীচ থেকে কে যেন ডাকল—গৌতম।

অঙ্ক ছেড়ে মিনু উচ্চকিত গলায় বলল—অমলদা।

বেরিয়ে আসতে চোখে পড়ল ফোর্ড ক্যালকন। মিনু ঠিক অমলের গলা চিনতে পারে। বললাম—ওপরে আয়।

—এখন না। ও আমার চোখে চোখ রাখল—তুই নেমে আয়। দেরী করিস না।

জুতোর ফিতে বাঁধছি, বাবা ধমক দিল—তাড়াতাড়ি কর।

আমার সেকশন অফিসার বাবা অমলের অ্যাডিশন্যাল সেক্রেটারী বাবাকে এত ভয় করে যে তার খানিকটা উপচে পড়ে অমলের বেলায়। আজ তাড়া দেওয়ার দরকার ছিল না, আমি মনে মনে ছটফট করছি কাসানোভার জন্য।

গাড়ির চাকা ঘুরতে একটা কুকুর কেঁউ কেঁউ আওয়াজ দিয়ে পালাল। বেচারী সামান্য উত্তাপের জন্য গাড়ির নীচে ঢুকেছিল, আর একটু হলে বেরিয়ে যেত উত্তাপ নেওয়া। বললাম—খুব বেঁচে গেছিস্ বেটা।

অমলের মুখখানা কেমন থমথমে। প্রায় এক কিলোমিটার চলে এসেছি, ও একটিও কথা বলল না।

বললাম—শঙ্করের খবর কী?

—ভাল না।

কেঁপে উঠি। বললাম—কী হয়েছে?

—দেখতে পাবি।

—কোথায় যাচ্ছি আমরা?

—কাসানোভায়।

গাড়ি কুয়াশার ভেতর দিয়ে চলেছে। আমি আচ্ছন্নের মত বসে আছি। কাসানোভায় গিয়ে কী দেখতে পাব? কী হয়েছে শঙ্করের? কী হতে পারে?

কাসানোভায় গেট পেরোতে দুঃখের গলায় অমল বলল—

—আজ শঙ্করের টেলিফোন করার কথা ?

—করেছিল ? আগ্রহের চোখে অমলের দিকে তাকালাম।

গাড়ি থামল। আমরা বেরিয়ে এলাম। লক করে অমল বলল—

—ও করে নি।

—তবে কে করেছিল ?

—হোটেলের ম্যানেজার। বলে পরিপাটি সাজানো লাউঞ্জের দিকে তাকাল। আমিও তাকালাম।

সকালের কুয়াসা কেটে রোদ ফুটছে। লাউঞ্জে ছিমছাম বেয়ারারা ব্যস্ত। দুচারজন করে লেডিস অ্যাণ্ড জেন্টেলমেন আসছে ব্রেকফাস্ট সারতে।

বলি—ম্যানেজার কী বলল তোকে ?

—বলল, আপনি এখনই চলে আসুন। আপনার বন্ধুর অবস্থা ভাল নয়।

আমরা অফিসের দিকে না গিয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

অমলের বাবার গাড়ি হোটেল স্টাফের চেনা। পার্ক করতে কেউ হয়ত রিসেপসনিস্টকে খবর দিয়েছিল, কিংবা ওই দেখেছিল, এগিয়ে আসে আমাদের দিকে পায়ে পায়ে। করুণ মুখ শুকনো গলায় বলল—সুইট নাম্বার সেভেনটি ওয়ান। ম্যানেজার ওখানেই রয়েছেন। প্রীজ গো দেয়ার।

—কী হয়েছে ? অমল জিজ্ঞেস করে।

—আ কেস অফ সুইসাইড। বলে যুবতী মুখখানা আরও করুণ করে।

আমার মাথায় চিড়িক দিয়ে গেল। এ আমি জানতাম কিন্তু খেলাটাকে ভীষণ ভয় বলে মনকে চোখ ঠারি। এখন রেজাল্টটা জানতে পেরে মাথা ঝিম ঝিম করে। কীভাবে আত্মহত্যা করল শঙ্কর ? পানভোজনের পর সিলিং ফ্যান থেকে ঝুলে পড়েছে···না ব্লেড দিয়ে হাতের শিরা···না রিভলভার ? ভাবতে পারি না তবু ভাবছি। কাওয়াবাতা গ্যাস খুলে ঘুমিয়েছিলেন···আজকাল অনেকেই ওভার ডোজ স্লিপিং পিল খাচ্ছে···

অমল বলল—চল, ওপরে যাই।

নীরবে উঠতে থাকি লিফটে। বেরিয়ে এসে নীচের দিকে দৃষ্টি ছড়ালাম। এখান থেকে লাফায় নি তো ?

আমার পা চলছে না। একটা বেতের চেয়ার বাইরে পাতা ছিল, বসে পড়ে বলি—তুই দেখে আয়।

দুমিনিটের মধ্যে অমল ম্যানেজারকে নিয়ে বেরিয়ে এল। ম্যানেজার ভেরি

সরি ভেরি সরি বলছে আর অমলকে তেমন দুঃখিত দেখাচ্ছে না। বেকুবের মত মুখ তুলি।

কাছে এসে অমল বলল—ভুল হয়েছে।

—কী ভুল?

—এ শঙ্কর বোস আমাদের ক্ল্যাক্সাক্ট নয়।

—তবে তোকে টেলিফোন করল কেন?

সামান্য ইতস্ততঃ করে অমল বলে—বাবার এক বন্ধু আছেন তাঁর নামও শঙ্কর বোস। আমার যখন ম্যানেজার বলল,—কাসানোভা থেকে বলছি, আপনার বন্ধু শঙ্কর বোসের অবস্থা ভাল নয়। আপনি চলে আসুন,—আমার বুকটা ধড়াস করে ওঠে। গাড়িটা বের করে সোজা তোর কাছে চলে গেলাম।

মনটা হালকা হল।

গাড়ি সরোজিনী নগরের দিকে ছুটছে ধাঁই ধাঁই করে। আমরা প্রকৃতি ও জীবন দেখছি। বেঁচে থাকা কত আনন্দের।

—লোকটার কত বয়েস রে?

—বুড়ো।

—সুইসাইড করল কেন?

—মনের দুঃখে। ব্যবসায়ে তেমন লাভ হচ্ছিল না।

—কী ভাবে করল?

—পটাশিয়ম সায়নাইড। অমল গাড়ির স্পীড কমিয়ে আমার দিকে মুখ ফেরায়—শঙ্করদের কোয়ার্টার্স কোনটা?

আঙুল তুলে দেখালাম।

শঙ্কর বেরিয়ে আসতে আমি হারয়ানির কথা বলি। তারপর অমল বলল—কী হল তোর চুটিয়ে ফুর্তি করা?

যেমন মুখ ঝুলিয়ে শঙ্কর বসেছিল তেমনি বসে রইল, কোন কথা বলল না। তখন পাগলাকে চটিয়ে দিতে খোঁচা মারি—খুব তো বলেছিলি, পান ভোজনের পর তেখ তেখ খেলা।

—খেলতাম। শঙ্কর অদ্ভুত এক চোখে তাকায়—বিজুটা মরে গিয়ে সব ওলটপালট করে দিল। নিজের দুঃখের কথা আর ভাবিনা।

জ্যোৎস্নাময় বসু-র গল্প

সুন্দর

এক একজন এমন থাকে যাদের দেখে চেনা যায় না। কথাটা হয়ত ঠিকমত বলতে পারলাম না। বলতে চাই যে অনেকের আকৃতি কেমন যেন পাল্টে যায়। প্রথমে যেমন দেখেছি পরে আর তেমন দেখি না।

বহু বছর পর চন্দনাকে আবার দেখলাম। যখন দেখলাম তখন নিজের পরিচয় দিতে পারলাম না। চন্দনা আমাকে চিনতে পারেনি। না পারাই স্বাভাবিক। আমি ঠিক চিনেছিলাম। আজ যেভাবে চিনলাম সময়মত সেভাবে চিনলে আমার জীবনের গতি হয়ত ঘুরে যেত। কিন্তু তা হয়নি। এখন আর তা সম্ভব নয়। আমার হিসাব আর চন্দনার হিসাব এখন একেবারে আলাদা। কোন মিল নেই। চন্দনার কাছে জীবনের অঙ্ক শেখা আমার উচিত ছিল।

নতুন বয়সে চন্দনাকে দেখে আমার মনে কোন রং ধরেনি। রং না ধরলেও আলাপ পরিচয় হতে বাধা ছিল না। সে ছিল আমার প্রতিবেশী।

আমি 'ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ' পর্ব শেষ করে সবেমাত্র তখন মানুষ হয়েছি। মানুষ হয়েছি কি হইনি সেটা তর্কের বিষয় তবে সেই রকমই শুনতাম। পরীক্ষায় পাশ করবার মাথায় যখন চাকরী জুটে গেল তখন কথাটা কানে আসত, সুরেশবাবুর ছেলেটা মানুষ হয়েছে। চারদিক থেকেই কথাটা কানে আসত। ঠাকুমা পিসিমা গোছের দু একজনকে আর একটু আগ বাড়িয়েও বলতে শুনেছি, ছেলের এবার একটা বিয়ে দিয়ে ঘরে বৌ নিয়ে এস।

এরকম কথা শুনে আমি বিন্দুমাত্র লজ্জিত হইনি। মানুষ হয়ে মানুষের ধর্ম-পালন করা স্বাভাবিক ব্যাপার, কর্তব্য। কাজেই তখন কোন তরুণীকে দেখলে বা আলাপ পরিচয় হলে সে আমার বিবাহযোগ্যা কিনা নিজের অজান্তে মনে মনে তাই বিচার করতাম।

বাংলাদেশের বাইরে মফঃস্বল সহরে তখন আমি এভাবেই মানুষ হয়ে উঠছিলাম। আমার বাসার সামনে ছোট একটা ঘাসজমি ছিল। বিকালবেলা

অফিস থেকে ফিরে বারান্দার সিঁড়িতে বসে আমার অনেকটা সময় কেটে যেত। বসে বসে শুধু ঘাসজমিই দেখতাম না রাস্তার দিকেও নজর থাকত।

বারান্দা থেকে রাস্তায় লোক চলাচল দেখতে আমার ভালই লাগত। লোকজনদের মধ্যে আবার তরুণীদের দেখতেই বেশী আগ্রহ ছিল। কিছুদিনের মধ্যে জনকয়েকের ভঙ্গী আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। তাদের দিকে আর না তাকিয়েও ভঙ্গীটি বলে দিতে পারতাম। সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করত শীলা। তখনকার দিনে শীলাকে আধুনিকা বলা যেত। সালোয়ার কামিজ পরে কটি বাঙ্গালী মেয়ে তখন রাস্তায় বেরোত? শীলা সালোয়ার কামিজ পরে স্বচ্ছন্দে রাস্তায় হেঁটে বেড়াত কিন্তু আমার বারান্দার সামনে এসেই যেন কিরকম হয়ে যেত। কামিজটাকে সাবধানে সকলের অলক্ষ্যে (?) টেনে সোজা করতে করতে সটান হয়ে গম্ভীরভাবে চলত তখন। ভুলেও আমার দিকে তাকাত না। আমার ভালও লাগত হাসিও পেত। নন্দিতার ভঙ্গী ছিল ঠিক তার উল্টো। আমার বারান্দার সামনে উচ্ছল হয়ে বলকে বলকে হাসতে হাসতে চকিতে বার দুই আমার দিকে তাকিয়ে চলে যেত। এরকম এক একজনের এক একরকম ভঙ্গী দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম।

একমাত্র চন্দনার কোন বিশেষ ভঙ্গী ছিল না। সহজভাবে চলত, চোখাচোখি হলে হেসে দু একটা কথাও বলত। আমিও তাকে বিশেষ লক্ষ্য করতাম না, কারণ প্রথম দর্শনেই আমি তাকে বাতিল করে দিয়েছি।

চন্দনা একটু মোটা, গোলগাল ধরনের চেহারা, রং কালো, চামড়া মসৃণ নয় আর প্রসাধনও বিশেষ করত না বা করতে জানত না। তেল তেলে দুবেণী পিঠে ঝুলিয়ে ট্যালকাম পাউডার মুখে মেখে নিজেকে আকর্ষণীয় না করেই পথে বেরোত। দেখতে বিসদৃশই লাগত, বিশেষত যখন ছোপ ছোপ সাদা পাউডার তার মুখে পিঠে গলায় ফুটে বেরোত।

আমি তখন বেশ মাকাল ফল। পাড়ার কর্তা গিন্নীরা আমায় বেশ খাতির করতেন, বোধ হয় ভাল পণ্যদ্রব্য ভেবে। আমিও সে বিষয়ে সচেতন ছিলাম। সবার বাড়ীতেই আমার ছিল অবারিত দ্বার।

অবারিত দ্বার থাকা সত্ত্বেও সবার বাড়ীতে আমি বিশেষ একটা যেতাম না। শীলা নন্দিতার বাড়ীতে তো অনাহুত হয়ে কখনই যেতাম না। চন্দনার বাড়ীতে কিন্তু প্রায়ই যেতাম। দীপেনবাবু, মাসিমা খুব খুসী হতেন, আন্তরিকভাবে খুসী হতেন। আমার সঙ্গে বেশ গল্প জমে উঠত। চন্দনাও আমাদের গল্পে যোগ দিত।

আমি আলাদাও চন্দনার সঙ্গে নানা গল্প করতাম, নিজের কথা বলতাম, হাসি-ঠাট্টাও করতাম। তার কাছে দর বাড়াবার কোন প্রয়োজন বোধ করিনি।

কিছুদিন এভাবে কাটিয়ে দেখলাম মানুষ হওয়া সহজ কর্ম নয়।

চাকরীতে অল্পদিনের মধ্যেই খটকা লাগল। ভেবে পেতাম না আমাকে মাসে মাসে অতগুলি টাকা মাইনে দিয়ে অফিসের কি লাভ হচ্ছে। কলেজে পড়বার সময় মাষ্টারমশাইদের—পুরি মাষ্টারমশাই বললে তাঁরা রাগ করবেন—অধ্যাপকদের মুখে শুনতে শুনতে স্থির করেছিলাম দেশগড়ার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করব। কি ভাবে দেশগড়ার কাজ করা যায় সে সম্বন্ধেও একটা ধারণা আমার জন্মেছিল। আমার কর্তব্য আমি নিষ্ঠার সঙ্গে সমরমত করলেই দেশ গড়ার কাজ এগিয়ে যাবে। সবাই যদি এভাবে তার কর্তব্য করে তাহলে দেশ গড়ার কাজ আপনা থেকেই হয়ে যাবে একথাই শিখেছিলাম। কাজেই আমার কাজ আমি নিষ্ঠার সঙ্গে করব এ দৃঢ় সঙ্কল্প আমি করেছিলাম।

বন্যানিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত একটা অফিসে চাকরী জুটতে খুসীও হয়েছিলাম। বছর বছর বন্যায় দেশের যে কত ক্ষতি হয় চাকরীতে যোগ দেবার আগেই সে তথ্য সংগ্রহ করেছি, মানুষ এবং গবাদি পশুর প্রাণের মূল্য—সে ক্ষয়ক্ষতির হিসাবে থাকত না। রাস্তা, রেল লাইন, শস্যহানি এবং রিলিফের হিসাবেই কয়েক'শ কোটি টাকার (তখনকার টাকার মূল্যের হিসাবে) ক্ষতি হত প্রতি বছর। সঠিক হিসাব এখন মনে নেই কিন্তু সেসব তথ্য তখন আমার মুখস্থ ছিল। যে হিসাব আমি জানতাম না তা হল, অসহায় গ্রামবাসীদের ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতির হিসাব সরকারী বা বেসরকারী হিসাবে পাওয়া যেত না। এ ক্ষতির হিসাব করবার প্রয়োজনীয়তা আমরা কখনো অনুভব করিনি।

যাই হোক বন্যানিয়ন্ত্রণের মত কাজ পেয়ে আমি খুব খুসী ছিলাম। সাড়ে ছয় ঘন্টার পরিবর্তে দশ বারো ঘন্টা কাজ করতেও আমি প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু খটকা লাগল ওখানেই। আমাকে যে কাজ করতে দেওয়া হত তা ঘন্টাখানেকের মধ্যে অনায়াসে শেষ হয়ে যেত। ঘন্টাখানেক পর ওপরওয়ালার কাছে গেলে তিনি চট করে কথা বলতেন না। তিনি ব্যস্ত থাকতেন। কখনও ঘন্টা দুই তিন পরে আসতে বলতেন, কখনও বা পরদিন যেতে বলতেন। এদিকে বসে বসে আমার আর সময় কাটতে চাইত না।

কিছু করার থাকত না বলে বসে বসে হিসাব করতাম। আমাকে যা মাইনে দেয় তার দৈনিক হিসাব করলে দাঁড়াত আট টাকা। আট আনা ভাড়া, আট

আনা প্রভিডেন্টফাণ্ড, মেসের খরচ দু'টাকা ; তার উপর সিগারেট, চা, সিনেমা ইত্যাদি খরচ ধরলেও দৈনিক চার টাকার বেশী আমার নিজের জন্য প্রয়োজন ছিল না। তাহলে বেঁচে যেত দৈনিক চারটাকা। দৈনিক আমাকে চারটাকা বাড়তি মাইনে দিয়ে কাজের বেলায় ঢু ঢু! আমি যা কাজ করতে পারতাম তার সিকি ভাগও দেওয়া হত না অথচ মাইনে খরচের তুলনায় ডবল। এ হিসাবটা আমি কিছুতেই মেলাতে পারতাম না।

কখনও ভাবতাম আমি নতুন তাই আমাকে তেমন কাজ দেওয়া হচ্ছে না। চাকরীতে যারা পুরানো তাদের সবাইকেই তো ব্যস্ত দেখতাম। ছুটি হবার সঙ্গে সঙ্গে অনেককেই টেবিল ছেড়ে উঠতে দেখতাম না। আধঘন্টা থেকে একঘন্টা কখনও বা আরও বেশী সময় অফিসেই থাকতেন আর কাজ করতেন। আমার দেখে হিংসা হত। তাই ভাবতাম শুধু-শুধু বসিয়ে রাখবার জন্য অফিস রোজ আটটাকা আমার পিছনে বেশীদিন খরচ করবে না। কোথাও না কোথাও এ হিসেবের হিসাব ঠিকই হচ্ছে। সময়মত টনক নড়বে। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা!

এদিন আমার উপরওলা আয়েঙ্গার সাহেবকে গিয়ে বললাম যে আমার হাতে কাজ নেই, সময় কাটতে চায় না। তিনি শুনে রেগে গেলেন, সব সময় কাজ করবার জন্য উপদেশ দিলেন, অলসভাবে সময় নষ্ট করার জন্য ধমকা ধমকিও করলেন। ধমক খেতেও আমার ভাল লাগল।

কিন্তু তারপর আবার মুস্কিল। তিনি এত ব্যস্ত যে আমার কাজ বুঝে নেবার বা কাজ দেবার সময়ই পান না। আমিও নাছোড়বান্দা। আবার কাজের তাগাদায় তাঁর কাছে গেলাম। যেতেই বললেন, তুমি তো বড় ঝামেলার ছেলে! অলসভাবে সময় কাটাও আর কাজের সময় আমাকে বিরক্ত করে মার!

কিছুদিন পর সে অফিস থেকে আমি বদলি হয়ে গেলাম। হয়ত চাকরীই চলে যেত কিন্তু গভর্মেন্টের অফিসে একবার ঢুকলে সহজে চাকরী যায় না, তাই রক্ষা।

বারান্দায় বসে বসে তরুণীদের ভঙ্গী দেখবার বিলাসিতা আমার গেল। অবশ্য সে বিলাসিতায় ইতি মধ্যেই অনেক টান পড়েছিল। আগের মত আর উৎসাহ পেতাম না। তারও কিছু কারণ ঘটেছিল।

দীপেনবাবুর বাড়ী যাতায়াত করতে করতে এক সময় আমি চন্দনার অঙ্কের মাষ্টার হয়ে গেলাম। কেউ যে নিয়োগ করেছে বা অনুরোধ করেছে—তা নয়—

আপনা আপনিই হয়ে গেলাম। প্রথম প্রথম দুএকটা অঙ্ক বুঝিয়ে দিতাম। অঙ্ক ছিল আমার প্রিয় বিষয়; কাজেই অঙ্ক বুঝিয়ে দিতে আমার ভাল লাগত। নিজেই একসময় নিয়মিতভাবে চন্দনাকে অঙ্ক বুঝিয়ে দিতে শুরু করেছিলাম।

কিছুদিন পর শীলাদের বাড়ী আমার চা খাবার নিমন্ত্রণ হল। সেখানে একথা সেকথার পর সে বাড়ীর মাসিমা আমার পড়াবার ক্ষমতার প্রশংসা করলেন। চন্দনার মত মাথামোটা মেয়েকে আমি না হলে নাকি আর কেউ অঙ্ক কষাতে পারত না। তার মেয়ে শীলার খুব মেধা আছে কিন্তু দেখিয়ে শুনিয়ে দেবার কেউ নেই বলে তেমন ভাল ফল করতে পারছে না বলে আক্ষেপ করলেন। তারপর শীলাকে পড়া দেখিয়ে শুনিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করলেন। শীলা আর্টসের ছাত্রী। আমি তাকে কি পড়াব? আমার যোগ্যতাই বা কোথায়? কাজেই রাজী হলাম না। একই ঘটনা ঘটল নন্দিতাদের বাড়ীতে। আরও কিছু দিনপর দেখলাম যে চন্দনা আর আমার কাছে অঙ্ক কষতে আসছে না। বুঝলাম ব্যাপার অত সহজ নয়। মানুষ হওয়া চাট্টিখানি কথা নয়।

চন্দনা আর পড়তে না আসতে সন্ধ্যাটা একটু ফাঁকা ফাঁকা লাগত। বারান্দায় বসে সময় কাটাতেও উৎসাহ পেতাম না। এখানেও আমার সময় কাটতে চাইত না।

এসময় আমার বদলি হওয়াতে একদিক থেকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

নতুন অফিস আরও বড় অফিস। কাজের মনে কাজ হচ্ছে, কে কার ধার ধারে! দশদিন লেগে গেল আমার পোস্টিং হতে। কার কাছে কি কাজ করব সে সবের হিসাব তো আর চাট্টিখানি কথা নয়। সংশ্লিষ্ট কেরানীবাবুকে বলতে তিনি বললেন, দাঁড়ান—অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? ব্যস্ত হলে কি সব কাজ চলে? জয়েনিং রিপোর্ট দিয়েছেন এখন একটু চুপচাপ বসে থাকুন তো। সময় মত ঠিক আপনার পোস্টিং করে দেব। বলে তিনি পান জল খেতে বেরিয়ে গেলেন।

দশদিন ঘুরে ফিরেই কাটিয়ে দিলাম। বসবার টেবিল চেয়ারও নেই যে বসে থাকব।

নতুন অফিসে এসে দুটি বিষয়ে নিজেকে সংশোধন করলাম। এক, কাজের জন্য কাউকে আর ব্যতিব্যস্ত করে তুলি না। কাজের মনে কাজ হয়, আমি মাঝে মাঝে ধুয়া ধরি। সাড়ে ছয় ঘন্টার উপর আরও ঘন্টা খানেক অফিসে ব্যস্ত থাকবার কায়দাও আয়ত্ব করে নিয়েছি। দুই, বারান্দায় বসে তরুণীদের ভঙ্গী দেখবার অভ্যাস বর্জন করেছি।

চলছিল ভালই কিন্তু এখানেও ঘটমট লেগে গেল। দোষটা আমারই। সেই অফিসের বড় সাহেব হলেন আজোয়ানী সাহেব। আয়েঙ্গার সাহেবের তুলনায় অনেক উঁচুস্থানে তিনি বিরাজমান। তিনি হিসাব টিসাব করে এবং পরে ক্যাজুয়াল ছুটির দরখাস্ত দেন। তাতে যে কোন কাজ আটকাচ্ছে তা নয়—কিন্তু শৃঙ্খলা বলে একটা কথা আছে। এ নিয়ে তিনি অনেক হিসাব করলেন, কয়েক দফা পরামর্শ করলেন দাশগুপ্ত সাহেবের সঙ্গে। শেষে একদিন ফতোয়া ছাড়লেন। ক্যাজুয়াল ছুটি নিতে হলে ছুটিতে যাবার আগে দরখাস্ত দিতে হবে এবং তা মঞ্জুর করিয়ে নিতে হবে। দরখাস্ত মঞ্জুর না হওয়া পর্যন্ত কেউ নাগা করতে পারবে না। যতদিনের ছুটি দরকার অন্ততঃ ততদিন আগে দরখাস্ত দিতে হবে।

ফতোয়ার শেষের অংশটি পড়ে আমার কেমন যেন রসিকতা করবার ইচ্ছা হল। দশদিন পর থেকে দশদিনের ক্যাজুয়াল ছুটির দরখাস্ত পেশ করলাম। ছুটির কারণ হিসাবে লিখলাম যে এগার দিনের দিন আমি অসুস্থ হব বলে আশংকা করছি। দরখাস্তের সঙ্গে এককপি ফতোয়া জুড়ে দিলাম, শেষের অংশটিকে লাল কালি দিয়ে দাগিয়ে।

কিছুক্ষণ পর আজোয়ানী সাহেব সেলাম পাঠালেন। গিয়ে দেখি দাশগুপ্তও সেখানেও উপস্থিত। দুজনের মুখ থমথমে, আমার দরখাস্ত তাদের সামনে পড়ে আছে। তাতে অনেক কালোকালি লালকালির আঁচড় পড়েছে। বুঝলাম এ আর রসিকার পর্যায়ে নেই। প্রথম প্রশ্ন এল :—তুমি কি গণৎকার ?

দুজনের হাঁড়িমুখ দেখে আমারও পাল্লা দেবার ইচ্ছা হল। একটু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উত্তর দিলাম :—ঠিক জানিনা। অন্ততঃ সেটা আমার পেশা নয়।

এবার আজোয়ানী ফেটে পড়লেন।

—গণৎকার না হলে এগার দিনের মাথায় তুমি অসুস্থ হবে জানলে কি করে ?

আমিও বেশ স্পষ্ট উচ্চারণ করে জবাব দিলাম :—গণৎকার আমাকে হতে হচ্ছে। গণৎকার না হলে সত্যি অসুস্থ হয়ে পড়লে ছুটি পাব কি করে ?

আমার উত্তর ও পাল্টা প্রশ্ন শুনে আজোয়ানী এত রেগে গেলেন যে কোন কথাই বলতে পারলেন না। দাশগুপ্ত বললেন :—সত্যিকারের দরকার পড়লে কি ছুটি মঞ্জুর হবে না বলেছি ?

এবারে আমি আর একটা পাল্টা প্রশ্ন করলাম।

—যারা ছুটি নিচ্ছে তারা কি দরকার ছাড়াই নিচ্ছে ?

আজোয়ানী আবার স্মৃতিতে ফিরে এলেন। বললেন :—তুমি বড় আর্গুমেন্ট কর। কথাবার্তায় অসম্মানের ছাপ দেখতে পাচ্ছি।

তোমার পছন্দ না হলে চাকরী ছেড়ে দিতে পার।

আমি তখন মরিয়া হয়ে উঠেছি, বললাম :—আমার পছন্দের কথা ছেড়ে দিন। আপনি কি আমাকে চাকরী ছেড়ে দিতে হুকুম করছেন? আপনার এই হুকুম কি আমি পদত্যাগ পত্রে উল্লেখ করব আপনার কতোয়া এবং আমার দরখাস্তের নকল জুড়ে দিয়ে?

আমার কথা শুনে আজোয়ানী আবার রেগে কাঁই। দাশগুপ্ত বললেন :

—বয়সের সম্মান দিতে শেখনি?

—উনি বয়োজ্যেষ্ঠ হিসাবে কথা বললে আমি তার সম্মান দিতে রাজী আছি, কিন্তু উনি কি সে হিসাবে আমার সঙ্গে কথা বলছেন?

একথার পর আমার সাক্ষাতকার শেষ হয়েছে বলে দাশগুপ্ত আমাকে বিদায় দিলেন।

এঘটনার ঘন্টা দুয়েক পরে দ্বিতীয় কতোয়া এল যে অসুস্থতার বেলায় প্রথম কতোয়া কার্য্যকরী হবে না। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে আমার আবার বদলীর হুকুম হল।

এ বদলীর পর আমি নিজেকে তিন নম্বর সংশোধন করলাম। কোন ক্রমেই উপরওলার হুকুম বা কতোয়ার প্রতিবাদ করব না। এভাবে নিজেকে সংশোধন করতে করতে মানুষ হয়ে উঠলাম। এখন যে আমি মানুষ হয়েছি বা মানীব্যক্তি হয়েছি সে সম্বন্ধে আর তর্কের অবকাশ নেই। আমি পর্যায়ক্রমে আয়েঙ্গার দাশগুপ্ত ইত্যাদি হয়ে বর্তমানে আজোয়ানী হয়েছি। ডায়াবেটিস ব্লাডপ্রেসার বেশ উচুস্তরেই আছে। হার্টট্রাবল শুরু হতে বোধ হয় আর বিশেষ বাকী নেই।

যে বন্যানিয়ন্ত্রণের কাজে চাকরীতে প্রথম ঢুকেছিলাম সেই বন্যানিয়ন্ত্রণ এখনও করে যাচ্ছি। এই পঁচিশ বছরে বন্যা বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছি। বন্যার জল কতটা উঁচুতে উঠেছে, কত কিউসেক জল প্রবল বেগে বয়ে গেছে সে সব তথ্য আমার মুখস্থ।

এখন আমার কাজের অন্ত নেই। সর্বদাই কাজ নিয়ে ব্যস্ত। বছর বছর বন্যা হয়, তার সরেজমিন তদন্ত করি, আর রিপোর্ট তৈরী করি। এই রিপোর্টের ওজন বছর বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সে এক বিরাট ব্যাপার। এত বিরাট যে তদন্ত করে রিপোর্ট তৈরী করতে করতে আমার বন্যা আসে। আবার তদন্ত আবার

রিপোর্ট। কাজের অন্ত নেই। যত বন্যা হয় আমার অফিস তত বড় হয়। প্রতি বছর একটা হিসাব নিখুঁত ভাবে করে থাকি। বন্যার হিসাব নিকাশ করতে এবং রিপোর্ট তৈরী করতে আর কতগুলি নতুন পদ তৈরী করা প্রয়োজন। এই হিসাবের ভিত্তিতে প্রতি বছরই নতুন নতুন 'আমি' বহাল করি। তারা কিভাবে হিসাব নিকাশ করে সে খবর আমি রাখিনা কিন্তু যে মাইনেতে ঢুকেছিলাম তার চৌদ্দগুণ মাইনে পেয়েও আমি এখন খরচের কূল পাই না।

বন্যার তদন্ত, তার হিসাব নিকাশ আর রিপোর্ট তৈরী করতে সারাদিন যা পরিশ্রম হয় তাতে সন্ধ্যাকালে একটু ড্রিঙ্ক না করলে আর চলে না। সন্ধ্যাবেলা আমি আর বাড়ী থেকে বেরোই না। আমার স্ত্রীর আবার সন্ধ্যায় একটু না বেড়ালে মেজাজ ঠিক থাকে না। কোন অয়েলার বা দাশগুপ্ত তার সঙ্গ দেয়। ড্রিঙ্ক করতে করতে এক সময় ডিনার খেয়ে শুয়ে পড়ি। আমার স্ত্রী কখন ফেরেন আমি জানিনা, শুনেছি একটু দেরীই হয়। তাই তার জন্য আর অপেক্ষা করি না।

এবারে উত্তরবঙ্গে প্রবল বন্যার খবর পেয়ে ছুটে এলাম। আয়েঙ্গার বা দাশগুপ্তদের কাউকে পাঠিয়ে দিলেও আমার কর্তব্য সমাধা হত। রিপোর্টে আয়েঙ্গার বা দাশগুপ্ত সরেজমিন তদন্ত করেছেন বলে উল্লেখ করলে, তুমি কেন যাওনি এমন কথা কেউ তুলত না কিন্তু তবুও এবার আমি সরেজমিন তদন্তে এলাম।

আজোয়ানী হবার পর নিজে তদন্তে বিশেষ বেরোইনি। রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে রিপোর্ট তৈরী করেছি। অবশ্য একেবারেই যে যাইনি সেকথাও ঠিক নয়। কোন মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় যখন হেলিকপ্টারে করে 'দর্শনে' বেরোতেন আমি তাঁর সঙ্গ নিতাম।

কলকাতায় বসে বসে ভাল লাগছিল না। একবার কোথাও ঘুরে আসবার তাগিদ অনুভব করছিলাম। সেজন্য এবার উত্তরবঙ্গে বন্যা হতে এই সুযোগ আর ছাড়লাম না। এখানে এসে আমার আজোয়ানীর যাবার জোগাড় হয়েছিল আর কি? ঘন্টা কয়েক আগে বন্যা পরিদর্শনের শেষে আমার মাথায় একটা পোকা প্রবল ভাবে নাড়া দিয়েছিল। রেষ্ট হাউসে বসে কয়েক গেলাস পেটে পড়ার পরও পোকাটা যেতে চাইছে না। চোখের সামনে বারবার সে দৃশ্য ফুটে উঠছে। সৌন্দর্য্যের অর্থ যেন পাল্টে যাচ্ছে। বাগডোগরায় নেমে এক আয়েঙ্গারের ব্যবস্থাপনায় একটি গাড়ী নিয়ে রওনা হয়েছিলাম। ময়নাগুড়ি ছাড়িয়ে ধূপগুড়িতে

ডানদিকে মোড় নিয়ে খন্টা দুয়েকের পথ। তোর্সা নদীর বন্যায় অনেক গ্রাম ভেসে গেছে। সেটাই আমার গন্তব্যস্থল।

ধূপগুড়ি পর্যন্ত বেশ এসেছি। চওড়া রাস্তা, রাস্তার উপরটা বেশ মসৃণ, গাড়ীতে ঝাঁকুনী বিশেষ লাগেনি। আয়েসে হেলান দিয়ে বসে দুদিকের ধানক্ষেত আর পাটক্ষেত দেখতে বেশ লাগছিল। মাঝে মাঝে আনারসের ক্ষেতও দেখেছি তবে তার সীজন প্রায় শেষ। বেশ লাগছিল। সবুজের যে কত বাহার তাই দেখছিলাম। কোথাও হালকা সবুজ, কোথাও ঠিক ঠিক সবুজ, কোথাও গাঢ় সবুজ। দূরের গাছগুলির সবুজ রং এত গাঢ় যে ধানগাছের সবুজ থেকে একটা আলাদা রং বলে মনে হচ্ছিল। ক্ষেতে এই সবুজের বাহার দেখে দেশের উন্নতির কথা ভাবতে ভাবতে গর্ব বোধ করছিলাম।

ধূপগুড়ি থেকে ডান দিকে মোড় নেবার পর একটু এগোতে আয়েসে হেলান দিয়ে বসে থাকা আর হয়ে উঠল না। রাস্তা তুলনায় অনেক সরু এবং এবড়ো খেবড়ো। দুদিকে তাকিয়ে দেখলাম প্রচুর পাটের চাষ হয়েছে। পাট ওঠা শুরু হয়ে গেছে। তখনও বন্যাপ্লাবিত এলাকায় পৌঁছাইনি। রাস্তার উপর বাচ্চা ছেলেমেয়েদের ভীড়। সাত আট দশ বছরের ছেলে মেয়েরা পাটের গোছা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কেউ বা পাট শুকাতে দিচ্ছে, কেউ বা পাটের গোছা বাঁধছে। এদের থেকে ছোট ছেলেমেয়েরা রাস্তায় সময় কাটাচ্ছে। কেউ ছুটাছুটি করে খেলছে, কেউ কেউ ঝগড়া বিবাদ করছে আর কতক স্রেফ বসে আছে। এরা ইস্কুল টিস্কুলে যায় বলে মনে হল না।

হাইওয়ের দুপাশের ঘরবাড়ী থেকে এ রাস্তার দুপাশের বাড়ীগুলি অনেক আলাদা। বেড়ার দেয়াল তাও জীর্ণ, খড়ের চাল তাতে জল আটকায় বলে মনে হল না, মাটির মেঝে এবং দরজা জানালা বিশেষ নজরে এল না। বেড়ার ঝাপ দরজা জানালার কাজ করছে। মেয়েদের গায়ে রঙীন শাড়ীছাড়া আর কোন বস্ত্র দেখলাম না। ছেলেরা বেশীর ভাগ গামছা পরে আছে, দুচারজন অবশ্য লুঙ্গিও পরেছে। এ সব দেখতে দেখতে কিছুক্ষণের জন্য আজোয়ানীর কুলে গিয়েছিলাম। দেশ স্বাধীন হবার একত্রিশ বছর পর যে সেই একত্রিশ বছর আগেকার দৃশ্যই দেখতে পাব আশা করি নি।

এই একত্রিশ বছরে এই অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য যা উন্নতি হয়েছে তা এই রাস্তাতেই সীমাবদ্ধ। এই রাস্তা আমার মত আজোয়ানী দাশগুপ্ত বা আয়েঙ্গারের কাজে লাগছে সন্দেহ নেই। না হলে আজ হয়ত আমার আসাই হত না।

কিন্তু—এ রাস্তা গ্রামবাসীদের কতটা কাজে লাগছে তা আমার জানা নেই। অনুমান করতে পারি যে কদাচিত এরা যাতায়াতের জন্য এ রাস্তা ব্যবহার করে থাকে। পাট শুকাবার জন্য এ রাস্তা অবশ্যই কাজে লাগছে। না থাকলে পাটের দড়ির উপর ঝুলিয়ে পাট শুকাতে হত।

হঠাত মনটা বিষণ্ণ হয়ে উঠল। ভাবছিলাম আমি আজোয়ানী না হয়ে এদের একজনও তো হতে পারতাম। আমার আজোয়ানী হওয়া তো আকস্মিক ঘটনা, আসলে তো এদেরই একজন হবার কথা।

এই বিষণ্ণতা নিয়ে গাড়ীতে বসেছিলাম। কলাকাটার কাছাকাছি পৌছাতে রাস্তায় রিক্সা চোখে পড়ল। হঠাৎ একটা রিক্সার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। রিক্সার নাম চন্দনা। নামটা যেন আমাকে হঠাৎ নাড়া দিল। মুহূর্তের মধ্যে বিষণ্ণতা কেটে গিয়ে একটা সুখস্মৃতি মনে ভেসে উঠল। চোখের সামনে সেই বারান্দা, সেই শীলা-নন্দিতার লাস্যময়ী ভঙ্গী, চন্দনার অঙ্ক শেখা ইত্যাদি ছবির মত ভেসে উঠল। চন্দনা কোনদিনই আমাকে আকর্ষণ করেনি কিন্তু আজ এই চন্দনা রিক্সা দেখে কেমন যেন বিভোর হয়ে গেলাম।

বিভোর হয়ে অবশ্য বেশীক্ষণ থাকা গেল না। আমাদের গন্তব্য স্থলে প্রায় এসে গেছি। গাড়ী ছেড়ে একটা স্পীড বোটে উঠতে হবে।

তারপর বন্যার তাণ্ডবলীলা দেখতে লাগলাম। চারিদিকে জল, কোথাও ঘরবাড়ীর চালা দেখা যাচ্ছে, কোথাও গাছের ডাল পাতা দেখা যাচ্ছে, রাস্তা ঘাট ক্ষেত নদী নালা সব মিলে মিশে প্লাবনের বিরাটত্ব অনুভব করা যাচ্ছে। জোয়ার সময়ের প্লাবনের কথা বইতে পড়েছি, বছর বছর শক্ত শক্ত শব্দ ব্যবহার করে বন্যার রিপোর্ট লিখেছি কিন্তু সেগুলি সব লেখা, তা থেকে অনুভব করা সম্ভব নয়। আমি যেন বন্যার কথা নতুন শিখলাম। নৌকা করে অনেক পরিবারকে তখনও উদ্ধার করা হচ্ছে। রিলিফের নৌকাও মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের কথা বন্যার ফলে খাবার জলের অভাব। রিলিফের দুএকটা ঘাটিও পরিদর্শন করলাম। রিলিফের কাজ ভালই চলছে এবং সেকথাই আমার রিপোর্টে লিখব। আমার কাছে অনেকেই ভীড় করল।

কেউ আমার জবাবদিহি দাবী করল না। বন্যানিয়ন্ত্রণের আমি একজন কেউকেটা জেনেও আমাকে মারতে আশা তো দূরের কথা একটা প্রশ্ন পর্যন্ত করল না। বন্যানিয়ন্ত্রণের জন্য বড় বড় অফিস থাকবে, বছর বছর বন্যা হবে,

কিছুদিনের জন্য তাদের ঘরবাড়ী ছেড়ে রিলিফের ভরসায় থাকতে হবে এটা স্বতঃসিদ্ধ বলে সবাই জেনে গেছে।

কিন্তু এই যে সব গ্রামবাসী যাদের উৎপাদিত ফসল খেয়ে আমরা বেঁচে আছি তারা কেন আজ ভিখারী হয়ে গেল, খচ্ করে এ প্রশ্নটা আমার মনে এসে গেল। এদের রিলিফ দিয়ে বাঁচিয়ে রেখে আমরা আত্মপ্রসাদ লাভ করছি কেন? আর তা ফলাও করে রিপোর্ট করছি কেন? এরা আবার ফসল উৎপাদন করে আমাদের খাদ্য জোগাবে এই জন্যই কি এদের রিলিফ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখছি? এ কি ধরনের মানবতাবোধ? এ প্রশ্নগুলি কি এদের মনে জাগে না? এরা কি এসব প্রশ্নের জবাব চাইবে না? সব কিছু ভেঙে-চুরে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নতুন একটা করতে পারে না? মানুষ ও গবাদি পশুর প্রাণের মূল্য বন্যার ক্ষয়ক্ষতির হিসাবে কেন ধরা হয় না সেটা যেন কিছুটা বুঝতে পারছিলাম।

ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে একসময় একঘেয়ে লাগল। সর্বত্র একই দৃশ্য একই কাহিনী। প্রথম দর্শনে যে সব প্রশ্ন মনে হয়েছিল তা ইতিমধ্যেই অনেক ফ্রিলে হয়ে গেল। গত পঁচিশ বছর ধরে বন্যা নিয়ে রিপোর্ট তৈরী করছি, গবেষণা করছি। এ আর আমার বেশী দেখবার কি আছে? এই যে কিছুক্ষণ আগে কতগুলি প্রশ্ন আমার মনে এসেছিল এও তো এক ধরনের বিলাসিতা।

আমার একঘেয়েমীর কথা আয়েঙ্গার নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে। এই বুঝতে পারাটা তার ডিউটির অন্তর্গত তৎসত্ত্বেও আমাকে নতুন কিছু দেখাবার ইচ্ছা প্রকাশ করল। আশ্চর্য হলাম। একঘেয়ে লাগলে তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে হাতে গ্লাস ধরিয়ে দেবার কথা। আয়েঙ্গারও কি আয়েঙ্গারত্ব ভুলতে বসেছে। দেখাই যাক।

স্পীড বোট থামিয়ে একটা মাটির বাঁধে নেমে এলাম। বাঁধের উপর উঠে চোখ জুড়িয়ে গেল। অন্য ধারে বন্যার চিহ্ন নেই। সবুজ ধানের ক্ষেতে সূর্যের আলো, ছায়া আর বাতাস সে এক অপরূপ দৃশ্য। রাস্তা, ঘরবাড়ী, ক্ষেতে কর্মরত মানুষ দেখে অবাক হয়ে গেলাম। এ কোন রাজ্যে এসেছি? আমার তৈরী রিপোর্টে তো এর কোন স্থান হয়নি? শুনে আশ্চর্য্য হলাম যে এ গ্রাম নাকি বন্যাকে পরাস্ত করেছে; আরও শুনলাম এ কাজ একদিনে হয়নি। কয়েক বছর ধরে সম্পূর্ণ নিজেদের চেষ্টায় বাঁধ তৈরী করেছে। অবশ্য গ্রামের কিছুটা সুবিধা-জনক পরিস্থিতির দরুন একাজ সম্ভব হয়েছে। গ্রামের স্বাভাবিক রেষারেষি, জমি নিয়ে ঝগড়া বিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, বর্ণ-বিদ্বেষ ইত্যাদি সব কিছু নিয়েই

এই প্রচেষ্টা এরা সফল করেছে। গ্রামে রাস্তা অবশ্যই সরকারী রাস্তার মত পাকা নয়, স্কুল এবং একটা ছোট হাসপাতালও তৈরী করেছে।

এই প্রসঙ্গে ডাক্তারবাবু ও দিদিমণির কথা এসে গেল। এই দুজনকে নিয়ে সবাই উচ্ছ্বসিত। দিদিমণির কথা বলতে শ্রদ্ধা আর ভালবাসা সবার চোখে মুখে ফুটে বেরোচ্ছে। আমি সম্বর্দ্ধনা পেতে অনেকটা অভ্যস্ত। ফুলের মালা, প্রশস্তি, সম্মান এমন কি শ্রদ্ধাভক্তিও অনেক জায়গায় পেয়েছি কিন্তু সেখানে চোখ মুখের এরকম অভিব্যক্তি কখনও দেখিনি। এ অভিব্যক্তি একেবারে আলাদা।

বাঁধ থেকে নেমে গ্রামের পথে হেঁটে চললাম। ইতিমধ্যে আমার আগমন-সংবাদ প্রচারিত হয়ে গেছে। একটা ছোটখাট ভীড় জমে গেল। স্কুলের কাছাকাছি যেতে ডাক্তারবাবু আর দিদিমণির দেখা পেলাম। আমার কাছেই আসছিলেন তারা আরও কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে। পরিচয় না করিয়ে দিলে ওই দলের মধ্যে আলাদা করে চিনতে পারতাম না।

স্কুলে গিয়ে বসলাম। অনেক কথা হল, চাও খেলাম। আয়েঙ্গারই কথাবার্তা বলছিল ওদের সঙ্গে, আমার কথা বলার উপায় ছিল না। দিদিমণির দিকে তাকিয়ে আমি বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলাম। কল্পনার জালও বুনছিলাম। আমি আজোয়ানী নই, এই গ্রামে থাকি, স্কুলে মাষ্টারী করি। দিদিমণির সহকর্মী হিসাবে বা তার অধীনে মাষ্টারী করতেও আমার দ্বিধা নেই। শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে দিদিমণির সঙ্গে মিলে গ্রামে অন্যান্য কাজও করি। আমার চার পাশে প্রগাঢ় শান্তি। এ রকম কল্পনার মধ্যেও একরকম যেন জ্বালা, ব্যর্থতার গ্লানি আমাকে ক্ষত বিক্ষত করে চলেছে। মনের এই জ্বালা সত্বেও শান্তির স্বপ্ন নিয়ে জাল বুনেই চলেছি।

আমার স্বপ্নের জাল বোনা বেশীক্ষণ চলল না। আয়েঙ্গারের তাড়া খেয়ে আমাকে উঠতে হল। হাঁটতে হাঁটতে আবার বাঁধের উপর চলে এলাম। স্পীডবোটে উঠবার আগে ইচ্ছা হল দিদিমণিকে জড়িয়ে ধরে বলি যে তুমি আমাকে তোমাদের দলে নিয়ে নাও। আমি এই মুহূর্তে সব ছেড়ে দিয়ে তোমার সঙ্গে যোগ দিই। কিন্তু এসব কিছুই হল না।

বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে সবাই আমাদের বিদায় জানাচ্ছিল। আমি শুধু দিদিমণির দিকে তাকিয়ে ছিলাম। মোটা, গোলগাল, ধরনের চেহারা, রং কালো চামড়া মসৃণ নয়, প্রসাধনের বালাই নেই অথচ কি সুন্দর।

স্পীডবোট দূরে চলে যেতে মনে হল আমি সেই বারান্দায় বসে আছি শুধু একজনকে দেখবার উদ্দেশ্যে। সেই মোটা কালো, গোলগাল মেয়েটির প্রতীক্ষায় আমি অনন্তকাল বসে থাকব।

বিজনকুমার ঘোষের গল্প

ছিন্ন

অশোক নাগ সবে বত্রিশ পেরিয়েছে। চমৎকার চেহারা। ফরসা রং। টিকোলো নাক। নাকের ওপর সরু ফ্রেমের চশমা শুধু সৌন্দর্য বৃদ্ধিই করে না, দৃষ্টি শক্তিকেও করে শাণিত। তখন অনেক আবছা রহস্যময় ব্যাপার স্পষ্ট দেখতে পায়। ব্যাক-ব্রাশ করা কোকড়ানো চুলগুলি থাকে থাকে ওপরের দিকে উঠে গেছে। বাংলা ইংরাজী—দুই ভাষাতেই সমান দখল। আইন টাইনও ভাল বোঝে।

অশোক মাত্র দু' বছর হয় চাকরীতে ঢুকেছে। প্রাইভেট ফার্ম। কিন্তু ইতিমধ্যেই মালিকপক্ষ টের পেয়ে গেছে অশোক কি বস্তু! আর সহকর্মীরাও সেটা জানতে পেরে ভোট দিয়ে অশোককে বানিয়েছে ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারী।

এতে আর যাই হোক, খাটাখাটনি বেড়ে গেছে ভয়ানক। বাড়ি ফিরতে ফিরতে এক এক দিন খুবই দেরী হয়ে যায়। প্রায়ই ইউনিয়নের মীটিং থাকে। জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে বৈঠক। বৈঠক কখনো ভেঙে যায়, কখনো জোড়া লাগে। গেটের দু'পাশে পড়ে গরম ইস্তাহার। আবার এটা সেটা কিছু মিললেই গরম ইস্তাহারগুলি হৈ হৈ শব্দে তুলে ফেলা হয়। জয়ের পর কত স্থানের ব্যাণ্ডেজ তুলে ফেলাই তো রেওয়াজ। এতে যেমন আছে আনন্দ, তেমনি বিষাদ। তা, আনন্দ বিষাদ নিয়েই তো জীবন। অশোকের এখন এসব নেশার মতই গেঁথে গেছে।

এটা কিন্তু কিছুতেই বুঝতে চায় না কুমকুম। বেশি রাতে খেতে বসলেই শুরু হয়ে যায় ওর প্যানপ্যানানি, আমি কি নিয়ে থাকি বল তো?

অশোক হাসে, কেন, বিয়ের এক বছরের মধ্যেই তো বুবুনকে দিয়েছি। আরও চাই নাকি?

—যাও, তোমার সবটাতেই ইয়ার্কি।

—ঠিক আছে, কাল থেকে সকাল সকাল ফিরব।

—পারবেই না। তোমাকে ভাল রকম চেনা আছে।

অশোকের খাওয়া হয়ে গেছে। তবু টেবিলে বসে একটু গল্প করতে ভাল লাগে। নিজেকে নিয়ে গল্পই সব চেয়ে প্রিয় বলাই বাহুল্য। বলল, আগেকার জেনারেল সেক্রেটারীদের ধাঁচাই ছিল অন্য রকম। কিন্তু আমাকে তো সেরকম করলে চলবে না।

—ওঃ, তুমি ভারী আলাদা। তা না হলে সংসারের এই হাল?

অশোক হাসল।

—জানো, কত লোক বিশ্বাস করে আমাকে ওই পোষ্টে বসিয়েছে। আমাকে সবাই এক ডাকে চেনে। জেনারেল ম্যানেজার পর্যন্ত সিগারেট অফার করে।

—ওই আনন্দেই থাক।—কুমকুম কথাটাকে আবার ঘোরাল: কালতু খাটাখাটুনি করে তোমার কি লাভ? আয়নায় নিজের চেহারাটা একবার দেখেছ?

অশোক গলার স্বরটা একটু নিচু করল, কালতু নয়গো, ইণ্ডায়রেক্ট ভাবে প্রমোশন, স্পেশাল ইনক্রিমেন্টেরও অফার পেয়েছি।

—তা নিলেই পার।—কুমকুম এবার সোজাসুজি চোখের দিকে তাকাল।

—গরীব আছি গরীবই থাকব, তাই বলে এতগুলি লোকের সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করতে পারব না।—একথা বলে অশোক নিজের কলেজ লাইফের দিকে তাকাল। হুঁ, ওখানেও সে ছিল জেনারেল সেক্রেটারী। ভিয়েতনামে মার্কিন সৈন্য, কি গোয়ার ব্যাপারে যেমন তড়িঘড়ি বন্ধের ডাক দিয়েছে, তেমনি মিছিল নিয়ে গেছে ময়দানে প্রতিবাদ জানাতে—'আমার কলেজের অ্যানুয়াল ফাংসনে একটি পয়সাও এদিক ওদিক হয়নি। সবাই ভেবেছিল, ফাংসনের পরেই বুঝি অশোকের গায়ে টেরিলিনের নতুন প্যান্ট উঠবে। ওদের কি দোষ, পাঁচটা দেখেই তো মানুষের ধারণা জন্মায়। তো অশোকের গায়ে বরাবরের সেই তালি-মারা প্যান্ট দেখে অবাক হয়েছিল সবাই।'

অ্যানুয়াল ফাংসনের পর সরস্বতী পুজো। ছাত্ররা তো বটেই, স্বয়ং প্রিনসিপ্যাল পর্যন্ত অনুরোধ করেছিলেন ভার নিতে। অশোকের সেই এক গো, তা হয় না।

ডাকসাইটে প্রিনসিপ্যাল অঘোরনাথ চ্যাটার্জীর ভুরু কুঁচকে ওঠে, কেন হয় না?

—আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না।

প্রফেসরস্ রুমে সেদিন প্রত্যেকটি মাস্টারমশাই ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। বাংলার অধ্যাপক সুনীলবাবু বলেছিলেন, আরে, অনেকেরই ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই। তবে পুজো টুজো সবাই আনন্দ হিসেবে নিয়ে থাকে।

—আমি নিতে পারি না স্যার আমার আদর্শে বাধে।

তা অশোকের জীবনে এ পর্যন্ত কোন ছিদ্র তৈরী হয়নি যা দিয়ে আদর্শের জল গলে যেতে পারে। ওর গতিবোধ প্রখর। যা বিশ্বাস করে সেটাই মেনে চলে। এর বাইরে যায় না।

দু'খানা মাত্র ঘর। অশোক আজকাল আলাদা শোয়। বুবুনকে নিয়ে কুমকুম আলাদা। অশোক একটা সিগারেট ধরিয়ে এঘরে এল। চুলের গোছ বাঁধা ফিতেটা কুমকুমের দাঁতে। বুবুন অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

—আজ ইস্কুলে গিয়েছিল ?

—আজ তো ছুটি। মুসলমানদের কি একটা পর্ব। ভাল কথা, আমি পার্ক স্কুলে নাম ঠিকানা লিখে এসেছি। সামনের মাসে দশ তারিখে পরীক্ষা।

অশোক ধোঁয়া ছাড়ল ধীরে ধীরে, বেশ ছিলাম। আবার হাঙ্গামা—

—বাড়ির কাজেই তো তোমার যত হাঙ্গামা। ইউনিয়নের কাজ হলে তো এক্ষুনি ছুটতে।—কুমকুম কোড়ং কাটল।

বুবুন পাড়ার বিভাবতী শিশু নিকেতনে পড়ে। ইস্কুলটা ভাল, কিন্তু ক্লাশ ফোর পর্যন্ত। ফলে সব বাবা মার-ই লক্ষ্য থাকে দু' এক বছর পরেই ছেলেকে যাতে অন্য কোথাও চালান করা যায়।

সকালে বিছানায় বসে চা খাচ্ছিল অশোক। গীতা এল। গীতার ছেলে আর বুবুন একই ক্লাসে পড়ে। অশোকের সময় হয় না, তাই ছেলে দেওয়া নেওয়ার কাজটা গীতাই করে থাকে। বলল, দাদাবাবু, তোমার ছেলের এমাসের মাইনে বাকী।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস। আমার হয়ে তুই-ই দিয়ে দে।—অশোক বালিশের তলায় হাত দিল।

গীতা গালে আঙুল ঠেকাল, বাবা, বাবা, মাইনেটাও নিজে দিতে পার না ? আজ তো তোমার ছুটি।

—আচ্ছা, অমন করছিস কেনরে গীতা। তোদের ভরসাতেই তো পাড়ায় আছি।

গীতা একথায় বিলক্ষণ খুশি হল, কই দাও টাকা দাও।

এরও অনেক বাদে এল সকালের জলখাবার। দু'খানা রুটি আর সব্জি। সেসব খেয়ে বাজারে গেল অশোক। গীতা তখন বাজার করে ফিরছে। চোখাচোখি হতে একটু হাসল। অশোক দাঁড়াল, শোন গীতা, তোর সঙ্গে কথা আছে।

গীতা এগিয়ে এল, বল তাড়াতাড়ি, আমার অনেক কাজ বাকী।

কি ভাবে শুরু করবে একটু ভেবে নিয়ে অশোক বলল, পার্ক স্কুলে তোর ছেলের নাম ঠিকানা দিয়ে আয় না। সামনের মাসের দশ তারিখে পরীক্ষা।

—কেন দাদাবাবু? আর দু'বছর পড়ুক না।

—দূর বোকা—অশোক হাসল: এখনই ভর্তি হতে না পারলে পরে আর চান্স পাবি ভেবেছিস?

—দেখি।—গীতা চলে গেল।

অশোকরা তখন সবে সংসার করতে শুরু করেছে। গীতা ওদের বাড়ি বাসন মাজত। মেয়েটি খুবই ভাল। কখনো পুজোর শাড়ি পছন্দ হয়নি বলে ঝামেলা করেনি। তারপর গীতার বর অফিসে পিওনের চাকরী পেতে কাজ ছেড়ে দেয়। তবু গীতা মাঝে মাঝে বাড়ি এসেছে। এমনি দুটো সুখ দুঃখের কথা বলতে।

সম্পর্কটা পাকা হয় গত বছর বুবুনকে স্কুল থেকে আনতে গিয়ে। গীতাও ওর ছেলে গোবিন্দকে ভর্তি করিয়ে দিয়েছে। খুব ভাল লাগল অশোকের। বাবু ও ঝিয়ের ছেলে একই স্কুলে পড়ছে। পাশাপাশি। এর চাইতে সুন্দর আর কি হতে পারে!

কুমকুম কিন্তু সহজভাবে নিতে পারেনি ব্যাপারটা। বলেছে, এক্ষুনি বুবুনকে স্কুল ছাড়িয়ে দাও। ছি, ছি, শেষকালে ঝিয়ের ছেলের সঙ্গে পড়বে! তোমার কি প্রেস্টিজ বলে কিছু নেই?

অশোক হেসেছে।—ছাইভস্ম প্রেস্টিজ দিয়ে কি হবে কুমকুম। সমাজে সবাই সমান, ছেলেবেলা থেকে আমি এটাই চেয়ে এসেছি।

অফিসেও কুমকুমদের সংখ্যা কম নয়। এই তো সেদিন মূল্যসূচক বৃদ্ধির ফলে প্রত্যেকেরই উনিশ টাকা করে ডি. এ. বাড়ে। তাতে অ্যাকাউন্ট সেকসনের শম্ভুবাবু রেগে কাঁই। —কোন বিচার নেই ব্রাদার কোন বিচার নেই। আমারও উনিশ টাকা আমার বেয়ারারও উনিশ টাকা। এ জন্যেই তোমাকে ইউনিয়নের নেতা বানিয়েছি?

অশোক জবাব দিয়েছে, আপনার মাইনে তো বেশীই। এটা হল ডি. এ। জিনিসপত্রের দাম বাড়ায় সবার উপরেই সমান চাপ পড়েছে।

—ওসব কচকচি ছাড় তো। আগ জানলে রাত জেগে এম. কম্ পরীক্ষা দেয় কোন শাল।

গত ইলেকসনের সময় এই শম্ভুবাবুকেই তাঁদের এলাকার প্রার্থীর জন্যে সোৎসাহে চাঁদা তুলতে দেখা গেছে। যেই প্রার্থী সাম্যবাদে বিশ্বাসী একজন পোড় খাওয়া মানুষ। অশোক মনে করে প্রত্যেক মধ্যবিত্ত বাঙালী মনের ওপরের দিকে একটা ফুটো থাকে। তা দিয়ে কাঁচা আদর্শবাদ গলে যায়। তলানি যা থাকে তার রং সর্বত্র একই রকমের। অর্থাৎ কুমকুমের সঙ্গে শম্ভুবাবুর, কিম্বা সুনীলবাবুর সঙ্গে সুলেখা দেবীর কোন পার্থক্য নেই। স্বার্থের চকমকিতে হঠাৎ কখনো ঘষা লাগলে এই রংটা চমৎকার দেখা যায়।

বুবুনের পরীক্ষার দিন অশোক অফিস গেল না। সকাল আটটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত ইংরেজী, বাংলা, অঙ্ক, সাধারণ জ্ঞান যাচাই হবে। চারপাশে প্রচুর বড় বড় মাথা। পাশে পাশে ছোট ছোট মাথা। সব ভিড়ের মধ্যেই এক জন করে সবজান্তা থাকে। অশোক সেই সবজান্তার কাছে জানল, আড়াইশো ছেলে পরীক্ষা দিচ্ছে, নেবে মাত্র পঁয়ত্রিশটি বুঝলেন মশাই, ব্যাকিং ছাড়া কিছু হবে না—

ঘণ্টা বাজল। সাত নম্বর রুমে বুবুনকে ঢুকিয়ে দিয়ে অশোক বেরিয়ে এল। পার্ক স্কুলের মাঠে বড় মাথাগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল ভোর বেলার ঘাসে বিন্দু বিন্দু শিশির। তাতে রোদের রং লেগে ঝিকমিক করছে। ফাঁকা রাস্তা। একটা নীল রঙের মোটর হর্ন দিতে দিতে চলে গেল উত্তর থেকে দক্ষিণে। অশোক ঠোঁটে একটা সিগারেট লাগিয়ে তাতে আগুন দিতে যাবে, হঠাৎ 'দাদাবাবু' শুনে চমকে ফিরে তাকাল। গীতা।

—কিরে, গোবিন্দ পরীক্ষা দিচ্ছে তো?

—হ্যাঁ দাদাবাবু। তুমি বললে—

—বেশ করেছিস।—অশোক খুশি হল।

—আমার ভয় লাগছে দাদাবাবু।

—ভয় কিসের রে?

—গোবিন্দ কি পারবে?

—কেন পারবে না?—বলেই অশোক বুঝল মিথ্যা স্তোক। ওর বাবা ছিলেন হাই স্কুলের হেড মাস্টার। ঠাকুরদাদা কাঞ্চনপুর স্টেটের ম্যানেজার। অশোকের মাও কলেজে কিছুদিন পড়েছিলেন। তা পড়াশুনাটা ওদের রক্তের মধ্যেই ছিল। এই যে অশোক বুবুনকে নিয়ে বসতে পারে না, তাতে কিছু আসে যায় না। গোঁফের রেখা স্পষ্ট ওঠার আগেই বুবুন হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে যাবে। আবার কিছু দিন পর ঢিপ করে প্রণাম করবে। এম. এ-তে ফার্স্ট ক্লাস। আর

বেচারা গোবিন্দ এই জেনারেশন থেকে ইস্কুলে যাচ্ছে। চমকে উঠল হঠাৎ। এই যে দুই পরিবারের পার্থক্য—তার জন্যে কি অশোক গর্বিত? না, কেন গর্বিত হবে? অশোকের পূর্বপুরুষরা বুদ্ধিমান, তাই শিক্ষার সুযোগটা নিয়ে নিয়েছে আগেভাগে। তবে গীতা ঝিয়ের কাজ করেও যে ছেলেকে ইস্কুলে পাঠাচ্ছে, সেটাই তো সুখের কথা। তা কয়েক পুরুষ যাক না, ওরাও সমান শিক্ষিত হয়ে উঠবে। আর অশোক তো তাই-ই চায়।

খুশি হয়ে অশোক সিগারেট ধরালো। বেলা নটার ভোঁ বাজল বাতাসে। আর কতক্ষণ পরীক্ষা চলবে? অনেক দূরে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়ায় গীতা ক্লান্ত হয়ে বসে আছে। ওর শরীরটা বরাবরই খারাপ। গোবিন্দও রোগা। ওর পাশে স্বাস্থ্যে লাবণ্যে ভরপুর বুবুনকে মনে হয় অনেক বড়। অশোক ভাবে, এর মূলে আছে কুমকুমের যত্ন আর ভাল ভাল খাবার দাবার। ইস্কুলের টিফিন ডিম সিদ্ধ আর দুটো সন্দেশ। এ ছাড়া বাড়িতে দু'বেলা মাছ, ফল, দুধ, হরলিকস—কত কি। একটা শিশু যখন বাড়তে থাকে তখনই দরকার হয় পুষ্টিকর খাদ্যের। নাহলে বুদ্ধির বিকাশ ঘটে না। এই তো সেদিন অশোক গীতাকে বলেছিল, তোর ছেলেটা দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছে কেন রে? কি খেয়ে ইস্কুলে যায়? গীতা উত্তর দিয়েছে, বাসি রুটি আর চিনি খেয়ে ইস্কুলে যায় দাদাবাবু। কোথা থেকে খাওয়া দেব? দু মাস ওদের কারখানার ধর্মঘট চলছে—

অশোক খুব গোপনে আবার চমকে উঠল। একটি শিশু খেতে পায় আর একটি খিত পায় না—এসব এই হতভাগ্য সমাজেই সম্ভব। এর মধ্যে কোন আনন্দ থাকতে পারে না। কেউ যদি আনন্দ খুঁজে পায় তো সে অতি নিম্ন স্তরের মানুষ। দারুণ অস্বস্তিতে অশোক দ্রুত পায়চারি করতে লাগল।

ঘণ্টা বাজল। বড় মাথাগুলি ছুটে গেল ছোট মাথাগুলিকে সামলাতে। বেলা বেশ চড়ে গেছে। গীতাই দু'জনের হাত ধরে বাইরে নিয়ে এল। মুখ দেখেই বোঝা যায় খিদে লেগে গেছে। রাস্তা পেরোতেই মিষ্টির দোকান। গীতা জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। অশোক ধমক দিয়ে ভিতরে নিয়ে গেল সবাইকে। ফেরার পথে রিকশা করল অশোক। কিন্তু দাদাবাবুর পাশে কিছুতেই বসতে চায় না গীতা। কলত আবার ধমক দিতে হল।

গীতা আবার বোকার মত প্রশ্ন করে, পাশ করবে তো দাদাবাবু?

—হ্যাঁ করবে।—অশোক মনে মনে ভাবে, শুধু পাশ করলেই চলবে না,

পঁয়ত্রিশ জনের মধ্যে থাকতে হবে। তবে ও এখন চায়, গোবিন্দ ভর্তি হোক। নাহলে কে বুবুনকে ইস্কুলে নিয়ে যাবে দিয়ে যাবে ?

দিন সাতেক পর পরীক্ষার রেজাল্ট বের হল। সাত সকালে ইস্কুলে যেতে গিয়ে বাজার হল না। অশোকের মেজাজ গেল খিঁচড়ে। গম্ভীর হয়ে দাড়ি কামাতে বসে গেল। তার পরেই চিৎকার করে উঠল, আমার পেনটা কে নিল ?

গণ্ডগোল শুনে কুমকুম ছুটে এল, কি হয়েছে ?

—কি আবার হবে। কেন আমার জিনিস জায়গামত থাকে না ?

—এই তো পেন।

এক সেকেণ্ডে মেজাজ ঠাণ্ডা হবার কথা, কিন্তু তা হল না। আবার চেঁচাল, যেতে দাও অফিস যেতে হবে।

—ভাত হয়নি।

—কেন হয়নি।

—কয় দিক সামলাব ?—রুখে উঠল কুমকুম : সাতদিন হয় কি নেই। গ্যাস কবে ফুরিয়ে গেছে। আজ আবার বাজারেও গেলে না। তা বুবুনের খবরটা নিলে ?

—মাথায় ভূমিকম্প থাকলে যা হয়।—হতাশ হয়ে অশোক বিছানায় শুয়ে পড়ল : পণ্ডশ্রম—

ঠিক তখনই সুখবরটা দিতে ছুটতে ছুটতে এল গীতা, দাদাবাবু শুনেছ আমার গোবিন্দ—

অশোক খুব শান্ত গলায় বলল, হ্যা শোন, আমাদের বাড়িতে তুই কাজ করবি ?

গীতা চমকে উঠে দাদাবাবুর চোখের দিকে তাকিয়ে আবার চেষ্টা করল কথাটা শেষ করতে, জানো দাদাবাবু, গোবিন্দ—

অশোক বিরক্ত হল, সে সব পরে শুনব ; আগে বল কাজ করবি কি না ?

—না আমি কাজ করব না। গীতা আর এক মুহূর্ত দাঁড়াল না।

অনেক রাতে অফিস থেকে ফিরে আয়নায় তাকিয়ে চমকে উঠল অশোক। কপালের মাঝখানে একটা ছ্যাঁকা। যেন রাইফেলের গুলি পাস করে গেছে।

কুমকুম হাসল। খুব সস্তার আয়না। পারদ উঠে গেছে। সেবার লিয়ালদার রথের মেলায় সাধ করে কিনেছিল।

পিনাকীরঞ্জন গুহ-র গল্প

মাগুলা উপকথা

ঠাকুরদালানের একপাশে পা ঝুলিয়ে বসে সন্ন্যাসীচরণ তার নাতিকে জিজ্ঞাসা করছিল—অনেক লোক জমেছে, না রে ভ্যাবলা ?

আট বছরের ভ্যাবলা এক ফাঁকে উঠে পালিয়েছিল। তেল চুকচুকে বাঁশের গায়ে প্যাচানো হরেকরঙা রেশমী মিঠাই দিয়ে কেমন সব হার চুড়ি হাতপাখা আর ফুল তৈরী হচ্ছে—তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল সেসব। দেখতে দেখতে তার নোলায় জল গড়াচ্ছিল। কিন্তু মুখের আশপাশে এখনও তেলের ছোপ্‌টা ভালো করে মোছেনি। একটু আগে দাদুর কাছ থেকে পয়সা নিয়ে একটা বাল ফুলুরি খেয়েছে।

সন্ন্যাসীচরণ হাত চালিয়ে চারপাশটা একটু দেখে নিয়ে ফের ডাকতে লাগল—'ভ্যাবলা, ও ভ্যাবলা, কোথায় গেলি র‍্যা!' সেই ডাক শুনে ভ্যাবলা ইস্কুলবাড়ির পেছনে দৌড় লাগাল। সেখানে ঘণ্টা নেড়ে নেড়ে একটা লোক বায়োস্কোপের বাক্সে ছবি দেখাচ্ছে। একটা রঙচঙে বাক্সের গায়ে গোটা চারেক অ্যালুমিনিয়ামের টিকিন কৌটা আটকানো। সেগুলোর দড়ি লাগানো ঢাকনা খুলে ছেলেরা কুঁজো হয়ে ছবি দেখছে। আর লোকটা ঘণ্টা বাজিয়ে বাজিয়ে কাঁসর ছড়া কাটছে—বোম্বাই কো গেট দেখো—দিল্লী কো কুতুবমিনার দেখো—মজাদার তসবীর দেখো—ধর্মিন্দর কো খেল্ দেখো—!

ছুটো বাগ্দী গাওনার দলের অধিকারীকে মেলায় পৌঁছে দিয়ে রিক্সা নিয়ে ফিরে যাচ্ছিল। ভাবল একটু জিরিয়ে যাই। সন্ন্যাসীচরণের কাছাকাছি বসে পড়ে বিড়ি ধরাল। নেহাৎ বুড়ো চোখে দেখতে পায় না ব'লেই কাজটা সেরে নেয় ছুটো। কিন্তু বিড়ির গন্ধ টের পেয়ে সন্ন্যাসীচরণ কথা কয়—'কে গা?' ফুস্ ক'রে একমুখ ধোঁয়া উল্টোদিকে ছেড়ে দিয়ে ছুটো সাফাই গায়—'আমি ছুটো, ঠাকুরদালানে একটু জিরিয়ে নিচ্ছি।' তারপর অন্ধমানুষকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টায় বলে—'ও তোলা দা, একটু সরে বসে বিড়িটা খাও দিকিন্, শালার গন্ধে টেকা দায়।' আসলে সেখানে কেউই নেই, একটু ফিচ্‌লেমি করে ছুটো। তারপর ফের ফুক্ ফুক্ ক'রে বিড়ি টানে। মাঝে মাঝে কল্‌জেটার দম

না দিলে তার চলে না। সারাদিন খটর্ খটর্ কেবলই প্যাডেল চালাও আর চাকা ঘোরাও।

কাছাকাছি লোকের সাড়া পেয়ে একটু সরব হয় সন্ন্যাসীচরণ। আজকাল কেউই তার কাছে বেশীক্ষণ বসতে চায় না। তাকে ফাঁকি দিয়ে পালানো এখন খুব সোজা। না হলে ওইটুকুন পুঁচকে ছোঁড়া ভ্যাবলা, সেও কিনা ফাঁক বুঝে তাকে বসিয়ে রেখে সরে পড়েছে। মনে মনে তাজ্জব হয় সন্ন্যাসীচরণ। অঘোর—হ্যারা মুটো, আমার নাতিটাকে দেখতে পাচ্ছিস কোথাও ?

মুটো একটু ওদিক-ওদিক তাকিয়ে জবাব দেয়—না খুড়ো, কোথাও তো দেখছিনে তাকে।

শিব চতুর্দশীর মেলাটা মন্দ জমেনি। ঠাকুরদালানে লোক গিজগিজ করছে। মন্দিরে মেয়েরা সব লাইন দিয়ে বাবার মাথায় জল ঢালছে। নানা বয়সের মেয়ে বউ-বুড়ি। মুটোর মনে পড়ে নিজের মেয়েটার কথা। তিন বছর স্বামীর লাথি ঝাঁটা খেয়ে এখন বাপের বাড়ি এসে পড়েছে। সঙ্গে দু দুটো ছানাপোনা। সারা দিন ধকল ক'রে নিজেরই চলে না তারপর আবার শাকের আঁটি এসে জুটল। শত হলেও মেয়ে তো বটে, মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে নি। গায়ে-গতরে খাটে। চিত্তিরগঞ্জের মিল-এ জনা দশ-বারো লোকের ভাত বয়ে দিয়ে আসে দুপুরবেলা। হ'প্তার চার পাঁচ টাকা হয়। বাপের সংসারে তবু নুনটা-কাঁল্টা কিনে আনা যায় তাতে। চাই কী এক-আধ দিন তবো মাছটাও আনতে পারে ক্ষেমী। আহা মা-মরা মেয়েটা—কতই বা বয়স। মনে মনে একটু নরম হয়ে পড়ে মুটো। সকালে বেরোবার সময় বলে দিয়েছিল—'একটা বেল আর একটা ডাব বামুন-দিদিরা দেবে বলেছে, তুমি একটু বাতোসা এনে দিও, আমি সন্ধ্যের দিকে গা ধুয়ে বাবার মাথায় জল দিতে যাব।' হুঁ-হুঁ। কিছু করেনি মুটো। নিজের মনে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। এই বেলা গড়িয়ে বিকেল হওয়ার মুখে তার কথাটা খেয়াল হোল।

দুপুরে অবশ্য সে একবার বাড়ির দিকে গিয়েছিল কিন্তু তখন গঙ্গার ধারে সেই চ্যাঙা অশথ গাছটার নীচে মজলিশে না গিয়ে পারে নি। সারেঙ্গার বাবার ওই খেয়া ঘাটে মাঝিরা ব'সে গল্প-গাছা করে। রঙ্গ রসিকতা হয়। এ-হাত থেকে ও হাতে ঘুরে যায় গাঁজার কল্কি। কেলু মাঝির গেঁজে থেকে পয়লা নম্বরী পুরিয়া বেরোয়। ও বস্তুটার টানেই মুটো গাছতলায় না গিয়ে পারে না। দিনান্তে

একবার না টানলে শরীরটা কেমন যেন ম্যাদামারা মনে হয়। গাড়ীটা টানতে পাঁজরে হাঁপ ধরে যায়। শরীরের কাঠামোটা খট্‌খটিয়ে ওঠে।

দুপুরবেলা ওই আসরে আটকে গিয়ে বাতাসার কথাটা ভুলে মেরে দিয়েছে ঘুটো। মেয়েটা হয়তো বাপের জন্ত হা-পিত্যেশ করে বসে রয়েছে। বিড়িটায় মোক্ষম টান মেরে উঠে দাঁড়ায় সে। সন্ন্যাসীচরণকে বলে—'যাই গো খুড়ো, আমার আবার একটুকুন কাজ রয়েছে, রাতে আবার গাওনা শুনতে আসতে হবে।'

সন্ন্যাসীচরণ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে—'বেলা কত হোল র‍্যা ঘুটো?'

—'তা প্রায় চারটে হবে।'

—'মন্দিরে আমাদের বাড়ির বউকে দেখতে পাচ্ছিস?' সন্ন্যাসীচরণ আবার একটা প্রশ্ন বাড়িয়ে দেয়।

ঘুটো একটু দেখে নিয়ে বলে—'নাঃ, বউঠাক্‌রোণ্‌কে তো নাইনে দেখছি না, হয়তো জল ঢেলে চলে গেছে।'

'তা হবে।'—সন্ন্যাসীচরণ আপন মনেই কথা বলে। ঘুটো রিক্সার-সীটে উঠে বসে। রবারের ভেঁপুটা বারকয়েক বাজিয়ে লোকজন সজাগ করে দেয়। সন্ন্যাসীচরণ একটু উঁচু গলায় হাঁক দেয়—'ও ঘুটো, চলে যাচ্ছিস নাকি র‍্যা, আমাদের বাড়ির পথে গেলে বউমা'র একটু খোঁজ নিয়ে যাস্‌—আর, দেখিস তো শালার নাতিটা কোথায় আটকে রইল।'

প্যাডেলে চাপ দিয়ে মুখ দিয়ে কি একটা শব্দ করে ঘুটো। বোঝা যায় না। সন্ন্যাসীচরণ ঠাকুরদালানে নড়েচড়ে বসে। এই নাতিটা তাকে বড্ড জ্বালাচ্ছে। নেহাৎ মরা মেয়ের সন্তান তা-ই বিশেষ গালমন্দ করে না সন্ন্যাসীচরণ। তার একমাত্র ছেলে সুধন্তও যথেষ্ট ভালোবাসে ভাগ্‌নেটাকে। আর বাসবে নাইবা কেন, পাঁচ পাঁচটা বছর পরেও সুধন্তর নিজের কোনো ছেলেপুলে আসে নি। সন্ন্যাসীচরণ উলুবেড়ের পয়সাওলা পার্টি ঘর থেকে পিতিমের মতো সুন্দরী বউ এনে দিয়েছে ছেলেকে। কিন্তু সবই অদেষ্ট—সেখেনটাতেই মস্ত ফুঁটো—যেন হাঁ-করা বিশাল গর্ত—মনে মনে আক্ষেপ করে সন্ন্যাসীচরণ। বাপের আমল থেকে কন্ট্রাক্টরির পয়সা নেহাৎ কম আসে নি ঘরে। নিজেও যথেষ্ট করেছে। বছর দুয়েক আগে চোখ দুটো একেবারেই গেছে। হাজার ডাক্তার বদ্যিতেও কিছু করতে পারে নি। তার পর থেকে চেষ্টা-চরিত্তির ছেড়ে দিয়েছে নিজেই। সুধন্তও খুব একটা গা করে নি। ভেবে নিয়েছে ভস্মে ঘি ঢেলে আর লাভ নেই।

সন্ন্যাসীচরণও জানে, সংসারে বুড়ো মানুষ আর বেতো ঘোড়াতে কোনো তফাৎ থাকে না।

রাত ন'টায় চিত্তিরগঞ্জের চটকলে হুইসেল বাজতেই ঘুটো রিক্সা নিয়ে ঠাকুরতলার দিকে যাবে ভাবল। বাঁধের ওপর থেকে নেমে কেটোপোল পেরিয়ে সে বুড়ো বটতলার কাছে এসে বিড়ি ধরায়। আজ রাতভর যাত্রা চলবে ঠাকুর তলায়। মেয়ে-বউরাও রাত জেগে গান শুনবে। বাবার মাথায় জল ঢেলে তারা আর চোখের পাতা জুড়তে দেবে না। চতুর্দশীর ঝুঁরকো অন্ধকারে ক্রমশ সেঁধিয়ে যায় ঘুটো। অন্ধকারে নজর চালিয়ে টের পায়, সন্ন্যাসীখুড়োর বাড়ির সামনে সুধন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাড়ির বাইরের দাওয়ায় তুষ্টু গায়েন আফিংয়ের ঘোরে বিমোচ্ছিল। ঘুটো ইচ্ছে করেই রিক্সার রবারের ভেঁপুটা টেপে। সেই আওয়াজে তুষ্টুর চটকা ভেঙে যায়। শ্লেষ্মা জড়ানো গলায় বলে ওঠে—কোন্ শুয়োর ব্যাটা র‍্যা, বাপের সঙ্গে এয়ারকী মারতে লজ্জা করে না।

ঘুটো একটু খিটকেল্ শব্দ তুলে হাসে—'আমি গো খুড়ো, আঁধারে তেমন ঠাওর পাইনি, ভাবলুম কোনো অমাবস্যের মড়া বুঝি দোসর খুঁজতে বেইরেচে।' তুষ্টু গায়েন একথায় কোনো উত্তর করে না। ফের বিমোতে থাকে। সুধন্যর মনে লাগে কথাটা। সে ফুস ফুস করে সিগারেটে লম্বা টান দেয়। ঘুটো দাঁড়িয়ে পড়ে সেখানে। সুধন্য নিজের পকেট থেকে প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট বাড়িয়ে দেয় তাকে। লজ্জা পায় ঘুটো। সুধন্য খ্যাক্‌খ্যাক্ শব্দ করে বিশ্রী হাসি হাসে—'নে নে, আমি তোর জন্যেই দাঁড়িয়ে রইচি, আমায় একটু কটকে নে যেতে হবে রে ঘুটো।' কথাটা বলেই ফচ্ ক'রে কল্‌টিপে আগুন জ্বালায় ঘুটোর জন্য। সিগারেটটা ধরাতেই হয় ঘুটোকে। সে জানে, সুধন্যর কথার ওপর কথা বলার সাধ্য তার নেই। এই সেদিনও দুপুর বেলায় তাকে ডেকে পাঠিয়ে ফিসফিসিয়ে বলেছিল—'এক্কুনি একবার পা চালিয়ে কটকে যেতে হবে ঘুটো, কোমরের সোনার মাদুলিটা বোধহয় সোহাগীর বিছনাতেই ছিঁড়ে পড়ে গ্যাছে, মাদুলি শোধন করে না পরা অব্দি আমার জলগ্রহণ চলবে না, যা ভাই নক্সীটি।' সে রাজী হতেই পাঁচটা টাকা হাতে গুঁজে দিয়েছিল সুধন্য। তাছাড়া এই প্রায় রাতেই কটকে যেতে হয় বলে ঘুটোকে সে নেহাৎ কম কিছু দেয় না। যা হোক্ তবু সময়ে অসময়ে সুধন্যর কাছে হাত পাতা যায়। যদিও মাঝে মাঝে মনে হয়—এমনভাবে টাকা নেওয়া অলেখা, তবু না নিয়ে পারে না। নিঝুম রাত্তিরে এই কটকের সওয়ারীর কথাটা সে বেমালুম লুকিয়েই রাখে।

রিক্সায় উঠে বসে সুধন্য। তার পাঞ্জাবীতে খোশবাই টের পায় ছুটো। আহ বড় খানদানী বাস বেরোচ্ছে। প্যাডেলে চাপ দিয়ে রিক্সা ঘুরিয়ে ছুটো ফের বাঁধের ওপর উঠে আসে। কাঁচা মাটির রাস্তায় শব্দ তুলে গাড়িটা ঘট্-ঘট্ করে এগোয়। অন্ধকারের মধ্যে মেঠিয়ে যায় ক্রমশ। বেহারী ইটখোলার গায়ে জন কয়েক ভাঙাত বসে গাঁজা টানছে। ওদের কল্‌কির আগুন চোখে পড়ে। কে যেন হেঁকে শুধোয়—'ছুটো নাকি র‍্যা? এত রাত্তিরে চললি কোথায়? গাওনা শুনবি নে ঠাকুরতলায়?'

ছুটো রিক্সা না থামিয়ে জবাব ছুঁড়ে দেয়—'কবরেজ্ ডাকতে যাচ্ছি, এখুনি ফিরব, ঠাকুরতলায় দেখা হবে 'খন।' ইচ্ছে করে সে সুধন্যকে আড়াল করে রাখে। দূর থেকে এই নিখই আঁধারে ভাঙাত্‌রা বুঝতে পারে না কিছুই। ছুটো শুনতে পায়—ছিষ্টিধরের খেউড়—রাধে লো তোর আঁধার ঘরে বেড়াল ঢুকেছে/ ভাঁড় ভেঙেছে দই খেয়েছে মজা লুটেছে। মনে মনে তারিফ করে ছুটো। বেড়ে গায় বটে ছিষ্টিধর। সেবার হাড়োয়া বিষ্টুপুরের মেলায় ঘুমুরের দলে না বলে কয়ে ভিড়ে গিয়েছিল। কিন্তু টেকে নি। দলের মূল গায়েন হিংসে করে তাড়িয়ে ছেড়েছে। ছিষ্টিধর না কি দলের ভাগর ভাগর মেয়েগুলোর লোভে দলে ঢুকেছিল—এই অপযশ ছড়িয়ে দলছাড়া করে দিয়েছে তাকে। ছিষ্টিধর নিজেও খেউড় বাঁধতে পারে। অশথ গাছতলার খেয়াঘাটে এই সেদিন কেলু মাঝির নৌকোয় পা ঝুলিয়ে বসে গেয়ে উঠেছিল—এই জল্‌কে বসে কল্‌কেতে সই, বুকের আগুন ঝল্‌কে ওঠে। এমন আরও কত কী। ছুটোর সব মনেও পড়ে না। সে টের পায়, রিক্সাটা তার বাড়িঘরের কাছাকাছি এসে পড়েছে।

রাত তিনটে নাগাদ যাত্রা বেশ জমে উঠতে ছুটো একবার ভিড় সরিয়ে বাইরে এল। তলপেট ক্রমশ নীচের দিকে চাপ দিচ্ছে। ইস্কুলবাড়ির পশ্চিম দিকে আড়ালে এসে ফাঁকা হাওয়ায় বিড়ি ধরাল। গাওনার দল খুব একটা মন্দ গাইছে না। নিজে নিজেই একটা আন্দাজ তৈরী করে ছুটো। এই সেদিন ছিষ্টিধরের সঙ্গে গাঙ পেরিয়ে ফুলেশ্বরে গিয়ে যাত্রা শুনে এসেছে। সে গানের সঙ্গে কোনো তুলনাই হয় না। তবু মন্দের ভালো। ভীড়ের মধ্যেও ছুটো নজর চালিয়ে দেখে নিয়েছে, মেয়েটা শুনতে এসেছে কিনা। ঠাকুরদালানের ওপরেই বসেছে ক্ষেমী। মহল্লার প্রায় সব মেয়ে-বউরাই এসেছে। সুধন্যর বউও বাদ যায় নি। সুধন্যর 'পরিবার'কে চোখে পড়তেই ছু দণ্ড চোখের পাতা ফেলেনি

ছুটো। সত্যিই পিতিমের মতো রূপ। আহা, এমন পরিবার ফেলে কি না ওই ছেনালীটার ঘরে সুধন্য—। ভাবতে গিয়ে কোথায় যেন কষ্ট বোধ করে ছুটো। কিসে যে কী হয়। কত আশা সন্ন্যাসীখুড়োর বুকের মধ্যে আঁকুপাকু করে—ছুটো জানে, তার কিছুই শেষ পর্যন্ত ফলবে না।

আসরের গান স্পষ্ট ভেসে আসে—'শ্রীমতীর মন মানেতে মগন, ওধানে এখন যেও না।' ছুটো আকাশের দিকে তাকিয়ে গানটা উপভোগ করে। আপন মনেই তুড়ি দেয়। ছিষ্টিধর কখন এসে পাশে দাঁড়িয়েছে তা টেরও পায় না। ভাঙাতদের মধ্যে ছিষ্টিধরই যা একটু গানের ব্যাপার-স্যাপার বোঝে।

ছিষ্টিধর বিড়ি ধরিয়ে শুধোয়—'হ্যা রা ছুটো, তোর জামাইকে যেন গাওনার দলে দেখলুম মনে হোল।'

বিড়ির ধোঁয়াটা যেন ধক্ করে গলায় আটকে গেল ছুটোর—'কে বললি? আমার জামাই? নরেন্দর? কই, কোথায় দেখলি তাকে?'

—'ওই গিরিন্ রুমের ভেতর পেরথম দেখলুম, পরে দেখি রঙ্‌চঙ্ মেখে নারদ মুনি সেজে পাট করতেছে। তা তুই শালা কেমন উজবুক র‍্যা, নিজের জামাইকেও চিনতে পারলি নি।'

একটু চিন্তিত হয় ছুটো। জবাবে বলে—'হুঁ, উ শালার মামদোর ব্যাটাকে চিনে আমার কি নক্সী-নাভ্ হবে শুনি।' বিরক্তিতে মেজাজটা আগুন হয়ে যায়। আকাশের জ্বলজ্বলে তারাগুলির দিকে তাকায়। ফাল্গুনের আকাশে তুলোটে মেঘ চোখে পড়ে। অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে। ভোর হতে বিশেষ দেরী নেই। চোখ ফিরিয়ে আসরের দিকে তাকায় ছুটো। এক-আধজন উঠে পড়েছে এখনই। গানও প্রায় ভাঙো-ভাঙো। খুব জমজমাট বাজি বাজছে আসরে। বিবেকের গান হচ্ছে বোধ হয়।

ছিষ্টিধর বলে—'চল্, দেখি, কতদূর হোল—।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই গান শেষ হয়। তখন পুব আকাশ লালচে হয়ে উঠেছে। ছুটো তার মেয়েকে নিয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়ায়। সুধন্যর বউও সঙ্গে যায় তাদের। চলতে চলতে ক্ষেমী গালমন্দ ক'রতে থাকে সোয়ামীটাকে। আসরের গোঁফ-দাড়িতে ঢাকা নারদ মুনিকে চিনতে ওর অসুবিধে হয় নি। সুধন্যর বউ নরম গলায় ক্ষেমীকে শাসন করে—'ছি, সোয়ামীকে অমন কথা বলতে নেই রে—পুরুষ মানুষের জাত অমন কত দোষ করে তাতে আমাদের মুখ খুললে কি চলে!'

কিন্তু ক্ষেমী ঝাম্‌রে ওঠে—'উরে আমার বাপের ঠাকুর রে, দোষ করলেই হোল—ভাত দেবার ভাতার নয় কিল মারার গোঁসাই। অমন সোয়ামীর মুখে ঝুড়ো জ্বেলে দিই সাতবার।'

সুধন্যর বউ সঙ্গে থাকাতে একটু তফাৎ রেখে চলছিল ঝুটো। মেয়ের ঝাঁঝালো গলা শুনেও সাড়াশব্দ করল না। মনে মনে সুধন্যর কথা ভাবতে লাগল। বুড়ো বটতলার কাছে এসে নজরে পড়ল—এই সাতসকালে সন্ন্যাসী খুড়ো ছিপ নিয়ে সদর পুকুরে বসে রয়েছে। আর—সোহাগীর ঘরে রাত কাবার করে বাড়িতে ঢুকছে সুধন্য।

ঝুটো পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে শুধোল—'ও খুড়ো, ছিপের কিছু ঠাওর পাচ্ছ?' সন্ন্যাসীচরণ সাড়া পেয়ে উত্তর দেয়—'কাত্‌না নড়লেই আমি টের পাই রে বাপ্‌, —সব টের পাই।' তারপর শক্ত ক'রে ছিপের গোড়াটা ধরে সন্ন্যাসীচরণ। যেন নিজের জীবনটাকেই মুঠো ক'রে ধরেছে সে।

বাড়ির দিকে পা চালিয়ে দিয়ে ঝুটো আপন মনে ভাবতে থাকে—অন্ধ মানুষটা এত ঠাওর পায় কি করে।

অনুপকুমার আচার্য-র গল্প

কীট

আমার নাম সীমা। মেয়েদের নামের শেষটুকু চিরকাল এক থাকে না। আমারও বদলেছে। আগে রায়চৌধুরী ছিলাম। এখন দাশগুপ্ত লিখি। অবশ্য, লেখাপড়ার সঙ্গে আমার মতো মেয়েদের এখন সম্পর্কই বা কতোটুকু?

আমার বাবা সদাব্রত রায়চৌধুরী ডাক্তার ছিলেন। অ্যালোপ্যাথিক। অতো বড়ো নামের মতো না হলেও, পশার তাঁর কিছু কম ছিলো না। নিজের চেম্বার ছিলো সিঁথির দিকে। সেখানে নিয়মিত দু'বেলা বসা ছাড়াও কলে বেরুতেন প্রায়শ। অন্যান্য দিকেও তাঁর কিছু আয়ের উৎস ছিলো না, এমন নয়। মাত্র বছর দু'য়েক আগে টালা পার্কের যে বাড়ীতে তিনি মারা গেলেন, যতোদূর জানি, সেটি তাঁর সম্পূর্ণ স্বোপার্জিত অর্থের ফসল। এভাবে বলার কারণ আর কিছু নয়, বাবা তাঁর আয়-ব্যয়ের স্পষ্ট ছবিটা চিরদিন গোপন করতে ভালোবাসতেন। নিভৃত স্বপ্নের মতো।

হ্যাঁ, বাবার অনেক স্বপ্ন ছিলো বই কি। আমাদের ভাইবোনদের নিয়ে। বলা যায়, সে স্বপ্ন তাঁর বারো আনিই সফল হয়েছে। সংসারে সব স্বপ্ন সত্যি হয় আর ক'জনের?

আমাদের চার ভাইবোনের মধ্যে বড়দা বরাবর ছাত্র হিসেবে কৃতী ছিলো। শিবপুর থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করার পর এখন নামকরা একটি ফার্মের সঙ্গে যুক্ত। বাবা নিজে দেখেশুনে বড়ো ছেলের বিয়ে দিয়েছেন। গম্ভীর স্বভাবের বড়দা এখন বউ-ছেলে নিয়ে ঘোর সংসারী, ছোড়দা স্বভাবের দিক থেকে একেবারে অন্যরকম। যখন যেখানে আছে সেখানেই হৈ হৈ হুল্লোড়। প্রায় সারাক্ষণ মাতিয়ে রাখে। বড়দার মতো অতোখানি কৃতী না হলেও, তার চাকরীটিও মোটামুটি সম্মান্য। আমার চেয়ে বছর তিনেকের বড়ো ছোড়দা কিন্তু এখনো নিজের মতো করে সংসারের কোন দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করলো না। মা বিয়ের প্রসঙ্গ তুললে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে শুধু প্রগল্ভ হাসে। এবং যথারীতি উড়িয়ে দেয়। ছোড়দাকে নিয়ে আমার আজকাল কেমন সন্দেহ হয়। আমার ছোট ভাই সুব্রত এখনো ছাত্র। বয়েসে আমার চেয়ে বছর পাঁচেকের ছোট হলেও

আমার সঙ্গে তার খুনসুটি লেগেই থাকে। পিঠোপিঠি বলেই হয়তো। তবু, আমার জন্যে ওর একরকম টান আছে, আমি জানি।

অবশ্য একমাত্র মেয়ে বলে আমারও আদর-যত্ন বাড়ীতে একসময় কম ছিলো না। দাদারা ভালোবাসতো দারুণ। বাবার তো, বলতে গেলে, চোখের মণিই ছিলাম। মা-র কাছে শুনেছি, পরপর দু'ছেলের পর বাবা প্রায় মুষড়ে পড়েছিলেন। বাবার কোন আপন বোন ছিলো না। প্রায়ই সে প্রসঙ্গ তুলে মা-র কাছে আফশোষ করতেন, 'আমারও বংশে কোন মেয়ে নেই।' তারপর আমি হলাম। বাবার খুশীর অন্ত থাকলো না। প্রায় ডেকে ডেকে সবাইকে বলতে থাকলেন তাঁর মেয়ের কথা। ছেলেবেলায় তাঁর স্নেহের সবটুকু মনে থাকার কথা নয়। কিন্তু একটু বড়ো হবার পর আমিই যেন তাঁর একমাত্র কাছের মানুষ হয়ে উঠলাম। পড়াশুনোয় আমি কোন ভাইদের মতো ছিলাম না। বরং পড়াশুনো ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে আমার কৃতিত্ব ছিলো বেশী। স্কুল পালিয়ে বন্ধুদের সাথে সিনেমা দেখা, আড্ডা, হঠাৎ কোথাও বেড়াতে যাওয়া এবং ইচ্ছে করে বাড়ীতে দেরী করে ফেরায় আমার কোন ক্লান্তি ছিলো না। দাদারা এইসব পছন্দ করতো না। ক্রমশ বাবাও কিছুটা অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছিলেন, মনে আছে। তবু তিনি আমাকে তেমন করে সরাসরি কোনদিন কিছু বলেন নি। যেন তিনি ধরে নিয়েছিলেন, হাতের পাঁচটি আঙুল সমান হবার নয়।

অবাক হবার কথা, এতো সব করেও কিন্তু আমি স্কুলের গণ্ডী পেরোলাম। বাবা কিছুটা উৎসাহিত হয়েছিলেন, সন্দেহ নেই। আর আমার কথা না বলাই ভালো। যাই হোক ওইটুকুর জোরেই কলেজে ভর্তি হওয়া গেলো। আমি মুক্তির স্বাদ পেলাম। যদিও মানি নি তেমন করে, তবু এতোদিন সব কিছুর ভেতরে যেন একটা ভয়, শঙ্কা মিশে থাকতো। এখন সে সব কিছুই থাকলো না। প্রায় রোজ নতুন নতুন বন্ধু জুটতে থাকলো। মেয়েবন্ধু, ছেলেবন্ধুও। তাদের সাথে কখনো সিনেমা-থিয়েটার দেখা, রেঁস্তোরায় বসা কিংবা ময়দান কি আরো একটু দূরে কোথাও বেড়াতে যাবার উৎসব আমার কাছে প্রায় রোজকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। ঠিক এই সময় একটা কলেজ সোস্যালে বিজনের সঙ্গে আলাপ। আমার এক বান্ধবীর মাসতুতো দাদা। কাছাকাছি কোন শহরতলী থেকে পড়তে আসতো। দারুণ করিৎকর্মা ছেলে। চেহারাটিও মন্দ নয়। বেশ একটা পুরুষালী ধরন আছে। সেদিন কিন্তু বিজনের সঙ্গে বেশী কথা বলার সুযোগ ছিল না। ভীষণ ব্যস্ত ছিলো সে। পরে জেনেছিলাম, বিজন কলেজ ইউনিয়নের সর্বময় কর্তাও।

তারপর থেকে বিজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হতে থাকলো নিয়মিত। প্রথম প্রথম সে-ই আসতো আমার কলেজে। কখনো সখনো আমিও যেতাম। তার সাথে গঙ্গার পাড়, ভিক্টোরিয়ায় বেড়াতে বেড়াতে আমার প্রায় মনে হতো, আমরা কেমন একলা হয়ে যাচ্ছি। খুব খারাপ লাগতো, তা নয়। বরং মনে হতো, অনেকের ভীড় থেকে সরে এসে এই একা একা বেঁচে থাকা—বড়ো সুখের। বিজনের পাশে বসে থাকতে থাকতে আমি চোখ বুজে সেই সুখের ছোঁয়া টের পেতাম।

বিজন পাশ করে বেরুলো। এবং বলার কথা, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা চাকরীও জুটিয়ে ফেললো। যেখানে থাকতো, সেখানকারই একটা কারখানায়। আমি জানতাম তার অবস্থা ভালো ছিলো না। আজন্ম মামাবাড়ির অন্নে পালিত বিজনের এইটুকু পাওয়া বড়ো দরকার ছিলো।

আমি কিন্তু পড়াশুনোর এগোতে পারছিলাম না মোটেই। দেখেশুনে বাবা নিরাশ হয়ে পড়ছিলেন ক্রমশ। দাদারা আমার সম্পর্কে সব আশা ছেড়ে দিয়েছিলো আগেই। আমাকে নিয়ে বাড়ীতে একটা শলা পরামর্শ চলছিলো—আমি টের পাচ্ছিলাম। তবু কিছু বলছিলাম না। খাবার টেবিলে বসে মা একদিন বিয়ের কথা তুলতেই আমি জ্বলে উঠলাম। আমি বিজনের কথা বলে স্পষ্টত অন্য প্রসঙ্গ প্রত্যাখ্যান করলাম।

আমার সূত্রে বিজন আমাদের বাড়ীতে অপরিচিত ছিলো না। তার মতো চালচুলোহীন ছেলের সঙ্গে বাবা তাঁর একমাত্র মেয়ের বিয়ে দেবেন কী করে? আমার জন্যে তাঁর মার সব স্নেহ এক অব্যক্ত রাগ, দুঃখ হয়ে গিয়েছিলো সেদিন। এই প্রথম তাঁকে আমি আমার কোন ব্যাপারে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে দেখলাম। বড়দা রাগে ফেটে পড়লো, চিৎকার করে মাথায় তুললো বাড়ি, 'ওই রকম রাজনীতি-করা একটা বখাটে ছেলের জন্যে কি আমাদের মান-সম্মান থাকবে না?' ছোড়দার অমত অস্পষ্ট থাকলো না আমার কাছে। এই সব সময় আমাদের মতো সংসারে মা-র খুব ভূমিকা একটা থাকে না—শুধু চোখের জল ফেলা ছাড়া। আমার মা-ও তার বেশী কিছু করে উঠতে পারেন নি।

আমি প্রতিবাদ করতে পারতাম। কিন্তু করিনি, জানি না; কেন হয়তো ভেতরে ভেতরে একরকম জেদ কাজ করছিলো, তাই। আমি শুধু নিঃশব্দে সব ছেড়েছিলাম—বিজনের জন্যে।

বিজনের কারখানার কাছাকাছি নতুন বাসা নিয়ে আমরা জীবন শুরু করলাম।

তারপর প্রায় ছ'বছর কেটে গেলো দেখতে দেখতে। বাবার রাগ অবশ্য পরে আর ছিলো না। আমার এখানে এসেছেন। মা-ও দু'একদিন থেকে গেছেন মেয়ের কাছে। আজকাল অবশ্য আর আসতে পারেন না—শরীরের জন্যে। দাদার মনোভাবও পাল্টেছে হয়তো। তবু তারা কিন্তু আসেনি কখনো। শুধু সুব্রতই বা ছুটিছাটায় আসে যায়।

এরপর আমারও না যাবার কোন কারণ থাকতে পারে না। আর কারো জন্যে না হলেও মা-র জন্যে তো বটেই। বাবা মারা যাবার পর, বলতে গেলে প্রায় মাসেই একবার মা-র কাছে যেতে হয়।

অবশ্য এই ক'মাসের মধ্যে যাওয়া হয় নি একবারো, মানে যেতে পারিনি—বিজনের ভয়ে। কিন্তু আজকের চিঠি পেয়ে কোন ভয়ই যে আমাকে স্থির থাকতে দিচ্ছে না। মা-র অসুখের খবর দিয়ে সুব্রত লিখেছে, 'শিগগীর চলে আয়।' দুপুরে পিওন চিঠি দিয়ে গেলো। তারপর থেকে একরকম অস্থিরতা আমাকে ব্যস্ত রেখেছে। হয়তো এতোক্ষণ চলে যেতাম। শুধু বিজনকে বলার জন্যে...।

বাইরে শ্রাবণের বিকেল শেষ হয়ে গেলো। দুপুরের দিকে কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। এখনো নতুন করে আকাশে মেঘ জমছিলো। বিজনের যতো দেরী হচ্ছিলো ফিরতে, আমার নৈরাশ্য ততো বাড়ছিলো। আমার আর যাওয়া হয়ে উঠলো না আজ।

কারখানায় স্ট্রাইক শুরু হবার পর মানুষটার কিছু ঠিক-ঠিকানা নেই। সকালে বেরিয়ে যায়। দুপুরে রোজ ফেরেও না। রাতেও কি কিছু ঠিক আছে বাড়ী ফেরার? শুধু ইউনিয়ন অফিস আর ভলান্টিয়ার্স ক্যাম্পে যে কী এতো কাজ পড়ে থাকে, বুঝি না কিছু। প্রায় চার মাস হতে চললো—একভাবে চলছে। মিটমাট হবার কোন সম্ভাবনা নেই। মাঝে-মধ্যে শুনি অবশ্য, আলাপ-আলোচনা চলছে মীমাংসার জন্যে—কিন্তু কোথায় কী?

বেরুবো বলে রান্না-টান্না সেরে বসেছিলাম। বিজনের দেরী দেখে এখন সে সব গরম করতে বসলাম। বসে বসেও মা-র কথা ভাবছিলাম। সুব্রত বিস্তারিত কিছু লেখে নি। সম্ভাব্য সব রকম বিপদের কথা মাথায় ঘোরাফেরা করছিলো। এমন সময় বিজন এলো।

শুকনো মুখচোখের ওপর রুক্ষতার ছাপ স্পষ্ট। ঘড়ির কাঁটা ন'টা পেরিয়ে গিয়েছিলো অনেকক্ষণ। সামান্য কিছু কথাবার্তার পর বিজনকে বললাম; 'হাত মুখ ধুয়ে এসো। খেতে দিচ্ছি।'

খেতে বসলে বিজনের কাছে মা-র কথা তুলবো ভেবেছিলাম। তার আগে বিজন নিজের কথা বলতে শুরু করলো, 'কাল দার্জিলিং যাচ্ছি।' আমার এখনিতে চিন্তার শেষ ছিলো না। হঠাৎ আমার সব কেমন গোলমাল হয়ে যেতে থাকলো। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সে কি বুঝলো কে জানে। মুখ নামিয়ে ফের বলতে থাকলো, 'কাও কালেকশানের জন্যে। ওখানকার লোকাল কমিটির সেক্রেটারী এখানে আছেন। তাঁর চিঠি নিয়ে যাচ্ছি। অসুবিধে হবে না, ওরাই সব ব্যবস্থা করে দেবে।'

নিজের জগতের অনেক কথা বিজন আমাকে বলে না। এমন এতো সব কথা বললো বলে আমার ভালো লাগছিলো। হয়তো কোথাও যাচ্ছে বলেই। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কবে ফিরবে?'—'ঠিক নেই কিছু।' সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লো বিজন।—'দিন সাতেকের আগে নয়।' এই সব সময় বিজনকে যতোখানি চিন্তিত ও অন্যমনস্ক দেখায়, এখন কিন্তু সে রকম লাগছিলো না, অনেকটা হালকা মেজাজে কথা বলছিলে সে।

মা-র অসুখের কথা বললাম বিজনকে। আমার যাবার কথাও। কোন কথা না বলে চুপচাপ শুনলো বিজন। শুনেও অনেকক্ষণ নীরব থাকলো। তার মুখের রেখা দ্রুত পালটাচ্ছিলো। শেষপর্যন্ত অবশ্য রাজীও হলো। আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। অশান্তির সম্ভাবনাটুকু কাটলো বলে।

যদিও এই সব বিষয় নিয়ে আমাদের অশান্তির কোন নজির নেই, তবু বিজনের একগুঁয়েমির জন্যে দীর্ঘ কাল আমার ভেতর একটু একটু করে ক্ষোভ জমছিলো। সত্যি বলতে কী, এই ক' মাসে মা-র কাছে যাওয়া হয় নি শুধু বিজনের জন্যে। আমি তাকে বুঝতে ভুল করিনি। তবু, নিজের অজান্তে কোথাও মনের ক্ষোভ জমছিলো ইদানীং। সেই সব ক্ষোভ এই মুহূর্তে উড়ে যাচ্ছিলো—হালকা মেঘের মতো।

পরদিন সকালে বিজন বেরিয়ে গেলে আমি আর দেরী করলাম না। ট্রেনে-বাসে সারাটা পথ অন্যমনস্ক থাকলাম। মা-র জন্যে সব রকম বিপদের সম্ভাবনা পর্যায়ক্রমে উঁকি দিয়ে যাচ্ছিলো।

বাড়ী ঢুকতেও বুক কাঁপছিলো রীতিমতো। বারান্দায় উঠে আসতে আসতে বউদিকে হাসিমুখে এগিয়ে আসতে দেখলাম। আমাকে নিয়ে বউদি মা-র ঘরে এসে ঢুকলো। মা বিছানায় বসেছিলেন। আমাকে দেখে প্রায় হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। নিজের অসুখের কথা দূরে থাক, এতোদিন আসিনি কেন, বিজন

কেমন আছে, নিদেনপক্ষে একটি চিঠি দিইনি কেন—এই সব প্রশ্ন আর অভিযোগে আমাকে প্রায় মুহূর্তে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন। বউদির ভালো লাগছিলো না হয়তো। বেরিয়ে যাচ্ছিলো ঘর ছেড়ে। আমি থামালাম। 'মা এ ঘরে কেন?'

'ডাক্তার নীচের ঘরেই থাকতে বলেছেন। সিঁড়ি ভাঙা একেবারে নিষেধ।' বউদি দাঁড়ালো সামান্য। অসুখের আনুপূর্বিক বর্ণনা দেবার জন্যেই হয়তো মা-র শিয়রে বসে তাঁর অসুস্থতার বৃত্তান্ত শুনছিলাম। পিকলু ছুটে এলো কোত্থেকে। হয়তো আমার গলা শুনে থাকবে। নয়তো তার মা-র খোঁজেই আসা। এসেই আমার গলা জড়িয়ে ধরলো প্রায়, 'এতোদিন আসো নি কেন, পিসী।'

এ বাড়ীতে বড়দার দুরন্ত এই শিশুটি কিন্তু আমার প্রায় সর্বক্ষণের সঙ্গী। আমার সঙ্গে থাকবে, ঘুমোবে। এমন কি, যে ক'দিন থাকি, আমি না খাইয়ে দিলে চলবে না। গলা ছাড়িয়ে নিয়ে পিকলুকে কোলে তুলে নিতে নিতে আদর করলাম। তার কথার কি উত্তর দেবো ওই মুহূর্তে। আমি তাকে নানা কথা জিজ্ঞেস করছিলাম। পিকলু কিন্তু তার কোনো উত্তর দিচ্ছিলো না। সে কের জিজ্ঞেস করলো, 'বলো না পিসী, এতোদিন আমাদের বাড়ী আসোনি কেন?'

বউদি দাঁড়িয়ে ছেলের কীর্তি দেখছিলো আর হাসছিলো। আমি অপ্রস্তুত বোধ করছিলাম। সে অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্যেই বললাম, 'আমার অসুখ করেছিলো, বাপী।'

'কি অসুখ?' আমি জানি এরপর পিকলুর প্রশ্নের সীমা থাকবে না। বউদিও সেকথা বুঝে ছেলেকে সরাতে চাইলো আমার কাছ থেকে, কিন্তু পিকলু গেলে তো।

সারা বিকেল মা-র কাছে বসে থাকলাম। নিয়ম মতো ওষুধ খাওয়ালাম। সেই সঙ্গে পথ্যও। ডাক্তারের পরামর্শ মতো। মা-র কিন্তু আমাকে নিয়ে চিন্তার শেষ নেই। বিজন অন্য কিছু করছে কিনা, আমি তো এখন এখানেই থাকতে পারি, আমাদের নাকি চলছে না—তাঁর চিন্তার বহর শুনে আমার হাসি পাচ্ছিলো। কিছুতেই তাঁকে বোঝানো যাবে না।

সন্ধ্যের দিকে দাদারা ফিরলো। মা-র ঘরে এসে খোঁজখবর নিচ্ছিলো একেকজন। আমাকে বসে থাকতে দেখে বড়দা দু'চারটে মামুলি কথাবার্তার পর চলে গেলো। ছোড়দা যথারীতি হৈ চৈ করলো খানিক। ঠিক আগের মতো। তারপর সিরিয়াস ভঙ্গীতে এক সময় মন্তব্য করলো, 'তোর চেহারাটা বড়ো খারাপ হয়ে গেছে তো।' আমি হাসলাম সামান্য। মাথা নীচু করে।

সুব্রত বাড়ী ফিরলো একটু রাত করে। কলেজের পর কোন এক প্রফেসারের কাছে পড়তে যায় আজকাল। সেও অনেকক্ষণ লেগে থাকলো আমার পেছনে। পরে তার অভিন্ন দোসর বিজনদার খোঁজখবর নিলো। আমার কথা শুনতে শুনতে সুব্রত বললো 'দিদি একটা কথা বলবো, কিছু মনে করবি না ?'

আমি অবাক হচ্ছিলাম। সুব্রতর কথায় আলতো ঘাড় কাত করলাম। 'তুই এখানে আপাতত থেকে যা' কথা শেষ করে সুব্রত আমার দিকে তাকিয়ে থাকলো ক্ষণকাল। আমি তার কোন জবাব দিলাম না।

সুব্রত চলে গেলে আমি বাইরে এসে দাঁড়ালাম। বাইরে বৃষ্টি পড়ছিলো— ঝিরঝির। বারান্দার আলোয় তাকে অনেকটা মিহি কাঁচের গুঁড়োর মতো মনে হচ্ছিলো। আমার ভালো লাগছিলো না কিছু। এ বাড়ির সবাই যেন এতোদিন পরে হঠাৎ করে আমার সম্পর্কে একটু বেশী আগ্রহী হয়ে উঠেছে না ?

ওপরে বড়দার ঘরে টেলিভিশন চলছিলো। সংবাদটুকু শোনার জন্যেই দাঁড়ালাম খানিক। আমার রেডিওটা খারাপ হয়ে আছে কতোদিন। সারানো হচ্ছে না।

কদিন পর সকালে চায়ের টেবলে খোসগল্প জমে উঠছিলো। ছোড়দা খবরের কাগজ পড়ছিলো। বড়দাকে ডেকে একসময় রোমহর্ষক একটি ডাকাতির খবর শোনালো। বড়দা গম্ভীর মুখে শুনলো সবটা তারপর বলতে থাকলো, 'ল এণ্ড অর্ডার সিচুয়েশানটা দিনদিন কী ভাবে ডেটরিয়েট করছে দেখেছিস ?' ছোড়দা সে কথার কোন জবাব দিল না। সামান্য নীরব থাকার পর বড়দা আমার দিকে তাকালো, 'বিজনদের স্ট্রাইকের কতোদিন হলো ?' আমি পিকলুর জন্যে রুটিতে মাখন দিচ্ছিলাম। মুখ তুলে বড়দার প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়েও ক্ষণকাল আমার মুখে কোন কথা জোগাল না। হাতের ছুরি হাতেই ধরা থাকলো আমার। চোখের সামনে ভাসছিলো বিজনদের কারখানার ধর্মঘটি শ্রমিকদের শিবিরের ছবি। ওদিকটা গেলে যাতায়াতে চোখে পড়তো ধর্মঘটের দিনগত হিসেব। ক'দিন আগের দেখা সংখ্যাটি মনে করে ভাবতে চেষ্টা করলাম সঠিক হিসেবটুকু। পারলাম না। বদলে মোটামুটি দায়সারা গোছের একটা উত্তর মুখে এলো, 'মাস চারেক হবে।'

বড়দা গম্ভীর হয়ে যাচ্ছিলো ফের। বিজনের প্রমোশনের কথা জিজ্ঞেস করলো একসময়। আমি আলতো মাথা নাড়লাম।

বেলা বাড়ছিলো। মেঘলা আকাশের জন্যে যদিও সময়টাকে সঠিক বোঝা

যাচ্ছিলো না। দাদারা বেরিয়ে গেলে আমার হাতে কোন কাজ থাকলো না।

মা অনেকটা সেরে উঠছে এখন। আমার নিষেধ অমান্য করেই স্নান করে এলো একা একা। পিকলু কিন্তু আমার সঙ্গে লেগে থাকলো সারাক্ষণ। খাওয়াদাওয়ার পর সামান্য শুয়ে থাকলাম। আসলে ভেজা চুল বালিশে ছড়িয়ে শুকিয়ে নিচ্ছিলাম। অজস্র প্রশ্ন নিয়ে পিকলু বকবক করে যাচ্ছিলো। আমি অন্যমনস্ক থেকে তার কোন কোন কথার জবাব দিচ্ছিলাম। হয়তো তা বুঝে সব কথার জন্যে সে তেমন পীড়াপীড়িও করছিলো না আর।

ঘুম এলো না বলে মা-র ঘরে যাবো কি না ভাবছিলাম। মা নিজেই এ ঘরে এলেন। প্রসঙ্গ পালটে এবার তিনি বিজনকে নিয়ে পড়লেন। এতোদিন পরেও কোন পদোন্নতি ঘটলো না বলে দোষারোপ করছিলেন বিজনকে। এরকম উদ্যমহীন পুরুষের কিছু হয় না। ইত্যাদি। আসলে আমি তাঁর কথা শুনছিলাম না। ভালো লাগছিলো না। যে মানুষটা সামনে নেই, তাকে নিয়ে এ রকম কথাবার্তা পরোক্ষ ভর্ৎসনা আমার খারাপ লাগছিলো। অন্যরকম চিন্তা হচ্ছিলো।

আমি বিরক্ত বোধ করছিলাম স্পষ্টত। আমি কি ভুল করেছি কোন? আর সেই স্বীকারোক্তিই কি এ বাড়ী শুনতে চায়? কিন্তু তা তো নয়। বিজনের সংসার আমাকে অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত করেছে সত্যি কথা। মানুষটার আকাঙ্ক্ষা-টাকাঙ্ক্ষাও তেমন প্রবল নয়, মানি। তা নিয়ে আমার মনেও কিছু ক্ষোভ অভিমান আছে। কিন্তু অভিযোগ নেই। আসলে আমার দুঃখের নদী বয়ে যায় অনেকদূর দিয়ে।

আমি ভেবেছিলাম। বিকেলের দিকে চুল-টুল বাঁধা হয়ে গেলে মাকে সে কথাই বলছিলাম। মা রাজী হচ্ছিলেন না কিছুতেই। বউদি ঘরে ঢুকলো হঠাৎ। খানিকটা হন্তদন্ত ভাব। ঘরময় কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছিলো তার দৃষ্টি। মা জিজ্ঞেস করলে বউদি একই রকম ভঙ্গীতে নিবিষ্ট থেকে উত্তর দিলো, 'পিকলুর আংটিটা হাতে দেখছি না।'

'সে কি!' আমি অবাক হচ্ছিলাম। সারা দুপুর পিকলু আমার কাছে ছিলো। বকবক করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। তখনো তার হাতে আমি আংটি দেখেছি। ঘুম থেকে উঠেও অনেকক্ষণ সে আমার কাছে ছিলো। তারপর খেলতে চলে গেলো। বউদিকে বললাম সে কথা। বউদি কোন জবাব দিলো না। শুধু অপাঙ্গে দেখলো আমাকে। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

আমি কিছু বুঝতে পারছিলাম না ঠিকঠাক। তবু আমার ভালো লাগছিলো না যেন।

পিকলুকে কাছে ডেকে আঙটির কথা তন্নতন্ন করে জিজ্ঞেস করলাম। সে সঠিক কিছুই বলতে পারছিলো না। বউদির সম্ভবত মাথার ঠিক ছিলো না। প্রায় আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ছেলেকে কয়েক ঘা বসিয়ে দিলো। আমি ফের তাকে নিতে গেলাম—তার মা-র কাছ থেকে। বউদি ঝট্‌কা মেরে ছেলেকে আড়াল করলো প্রথমে। তারপর একরকম আগলেই সরিয়ে নিলো ছেলেকে। আমি নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকলাম।

সন্ধ্যের পর দাদারা ফিরলে আরো এক চোট হৈ চৈ হলো। নীচের ঘরে বসে থেকেই শুনতে পাচ্ছিলাম বউদির গলা, 'গেলোবারের জন্মদিনে বাবা ওকে দিয়েছিলেন।' তার ক্ষোভের কারণ অস্পষ্ট থাকছিলো না। কোন সংশয়ও ছিলো কী? ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। আমার অস্বস্তির সীমা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছিলো।

আরো কিছুক্ষণ পরে লোডশেডিং-এর মধ্যে মা-র ঘরের জন্যে একটা মোমবাতি খুঁজতে ওপরে যাচ্ছিলাম। বউদিকে ডাকতে গিয়েও বড়দার ঘরের সামনে থমকে দাঁড়াতে হলো-সেই অন্ধকারে। যেন আমার পায়ের শব্দ হঠাৎ থামিয়ে দিয়েছে কিছু গুঞ্জন। যেন হঠাৎ-ই ঘরের মানুষজন ছিটকে পড়লো এক পরিবেশ থেকে অন্য কোথাও। বউদি এতোক্ষণ পর যেন তার হাতের কাজে মন সংযোগ করার সময় পেলো। ছোড়দা নিঃশব্দে তার ঘরে চলে গেলো—আমাকে পাশ কাটিয়ে।

আমার ভেতরে শব্দহীন কি একটা কুরেকুরে খাচ্ছিলো। টের পাচ্ছিলাম। অথচ কিছু বলার ছিলো না।

সেই অন্ধকারে চৌকাঠের এপারে আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে শুধু বলতে পারলাম, 'বউদি, একটা মোমবাতি দাও।'

রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়ের গল্প

ভালোবাসা দীর্ঘছায়া

১

এইসব দুঃখ নাকি থেকে যায়, কারো কারো বুকের গভীরে। দুঃখ সা-জাহান করে। দুঃখ ফকির। কাব্যে দুঃখ খুব গাঢ় হয়। গল্পে ফ্যাকাশে। রবীন্দ্রনাথের কাছে সা-জাহান তাই এতো দুখী।

শুভজিৎ। আমাদের শুভো।

চৌত্রিশ ইঞ্চি বুক।

এই বুকে তার কিছু দুঃখ আছে গাঢ়। গভীর বেদনায় ও ঘুমের ভেতরে মাঝে মাঝে জেগে ওঠে রীনা-রীনা বলে।

কে রীনা? কোথায় থাকে?

গভীর ঘুমের মধ্যে ওই নাম এখন সজাগ?

২

ঘুম থেকে উঠে পড়ে শুভো। জানালা দরজা খোলে। সকালের রোদে ওর শরীরের ঘাম চোখে পড়ে। এটা তো গ্রীষ্মকাল। গ্রীষ্মে শুভোর খুব কষ্ট হয় বুঝি। সারারাত বিছানায় ছট্‌ফট্‌ করে। ঘামে এবং ঘেমে নেয়ে ওঠে।

এখন আটটা বাজে।

টেবিলে ঘড়িটা দেখে চমকে ওঠে শুভো। ভোর রাতে ঘুম বেশ গাঢ় হয়েছিলো। বাইরে বেরোয়। উঠোনে টাইম-কলে হাত-মুখ ধোয়। উঠোন আগুন যেন, রোদে পুড়ে। শিশিকল কিম্বা রোলিংমিলের ভাটিতে দাঁড়িয়ে।

এতোটুকু ছায়া নেই।

উঠোনে ব্যাঙের গর্তে রোদ ঢুকে যায়। রোদ ঢোকে মানুষের চামড়ার ভেতরে। সূর্য আড়াল করে দু'হাতের রক্‌ত দেখে শুভো। এক্স-রে প্লেটের মধ্যে মাঝে মাঝে কালো কালো হাড়।

শুভো ভাবে।

এই কি শরীর নাকি।

যুবক-যুবক আমি, এই বলে গর্ব করা যায়?

যাননা ভাবলে বড়ো দুঃখ আসে মনে। দুঃখ দুর্বল করে মন।

৩

এইসব কিছু দুঃখে শুভোজিৎ ক্লান্ত হয়ে আছে। নিজের শরীর দেখে দুঃখ পায়। দুঃখ পায় অসহায় আর্থিক জীবনে। অর্থ-চিন্তা কেড়ে নেয় সারাদিনে অনেক সময়। কি করলে অর্থ মেলে, এইসব দ্রুত-চিন্তা আশে-পাশে সব কিছু ফেলে রেখে ছোটে।

কবিতায় উজ্জ্বল শুভো। কবিতায় নীরব। কবিতা ভুলিয়ে রাখে সামাজিক ছোটো ছোটো কথা। অর্থ-কড়ি এসব তো সামাজিক অলংকারে লাগে। ওর বউ কতো ভালো সাজে। গা ভরতি সোনায় ও অসম্ভব সুন্দরী। সোনায় সুন্দর করে রাখে।

আরে শালা। ওর বর অর্থ ভালোবাসে। ওর বউ অর্থের সিন্দুক। দীপক মালির আগে ঘুম থেকে উঠে, ওর বর অর্থ তুলে আনে। ঘরে ফেরে মাঝ রাতে। ঘরে ফিরে পালঙ্কের দিকে চেয়ে দৃষ্টি থেমে যায়। ওর বউ। পালঙ্কে অর্থ রাখে। পালঙ্কে শরীর।

এই কি অর্থ নাকি। অর্থের মানে এতো ছোটো? এভাবে অর্থের মানে শুভোজিৎ কখনো করে না।

তবুও অর্থ চায় শুভো। অর্থ ওর একান্ত প্রয়োজন। শুভো মানে, অর্থ মানেই অলংকার নয়। অর্থ শুধু সোনা-দানা পালঙ্ক আনে না।

রাজু কাঁদে। উঠোনে প্রচণ্ড তাপ। তাড়াতাড়ি ঘরে ওঠে শুভো। দড়ি থেকে গামছা টেনে নেয়।

কি হলো রাজুর? বৌদি? কাঁদে কেনো? এই প্রশ্নে রাজুকে দু'হাত ধরে কোলে নেয় শুভো। আদর করে।

কাজু তুমি কাঁদছো কেন? খেলা করো। হাসো।

শুভোজিৎ কোলে নিলে চুপ করে রাজু। হেসে ওঠে। শুভো ওর হাসি দেখে। নিজে হাসে।

দুষ্টু কোথাকার!

আমার লজেন্স দাও। কাল তুমি দেবে বলেছিলে?

বলেছিলাম বুঝি? আচ্ছা পরে নিও।

না।

এখন পয়সা নেই। পরে দেবো।

দাওনা।

অসম্ভব বায়না ধরে রাজু। এমন করে না ও। কথা শোনে। কালকে শোবার আগে প্রতিশ্রুতি নিয়ে ঘুমিয়েছে। এখন শুনবে কেন শিশু? অমন করো না রাজু।

বৌদি ধমকে ওঠে।

কাকু তো বলছে দেবে। এখন পয়সা নেই বোঝো। কাকু কী চাকরী করে? বায়না থামায় রাজু। এ বড়ো নতুন কথা ওর কাছে। শুভোকে জড়িয়ে ধরে।

কাকু, চাকরী কি? চাকরী মানে পাচটা নয়া? আমার লজেন্স?

৫

বাইরে তীব্র গরম। প্রচণ্ড উত্তাপ। শুভোকে বেরুতে হবে। বেরিয়ে যায়। আজকাল খুব বেশী বাইরে ঘোরে ও। ঘরে ওর একদম ভালো লাগে না। একদম না। এখানে-ওখানে বসে গল্প করে। অথচ অভ্যাস মতো ঠিক ঠিক ঘরে চলে যায়।

ঘর মানেই তো জবর দখল চিন্তা কিছু। ঘর মানেই তো বৃদ্ধ পিতা অকর্মণ্য। চাকরী খোঁজো, চাকরী খোঁজো।

তার চেয়ে এ অনেক ভালো। শান্তি অনেক। বন্ধুরা সব আড্ডা থেকে আঙুল তোলে—

ওই তো শুভো।

এইখানে ও বেঁচে আছে। এইখানে ও যখন-তখন হেসে ওঠে, হাসির কথায়। শুভো জানে তবুও এখানে মন ভারি হয় কখনো-সখনো।

এই শুভো, দীঘায় বেড়াতে যাবি?

দীঘা নামে চমকে ওঠে শুভো। দীঘা মানেই তো সমুদ্রের গন্ধ আসে নাকে। সমুদ্র দেখেনি শুভো। সংগতি কোথায়? সমুদ্রে সূর্য ওঠা বেশ লাগে। সূর্য ওঠা। অস্ত যাওয়া। ছবিতে দেখেছে। সমুদ্র কি দিতে পারে শান্তি প্রচুর। দীর্ঘ কোনো ছায়া?

৬

কোথাও সামান্যতম ছায়া নেই। মাথার উপরে সূর্য রেগে ঝোম। রাস্তার টাইম-কলে, কুয়াতলায়, ক্ষুধার্ত মানুষগুলো রোজকার অভ্যাস মতো স্নান সেরে নেয়।

শুভোজিৎ উঠে পড়ে। অন্য সকলে। আড্ডা ভেঙে যায়। সময় রাখাল যেন, আমাদের হাত ধরে নিয়ে যায় ঘাসের জমিতে। সকলেই ঘরমুখো হাঁটে। শুভোজিৎও।

কোথায় যাচ্ছে শুভো রোজকার অভ্যাসে?

কতোটুকু ঘাস পাবে আজ?

এইবার ভাবনায় শুভো আরো ঘেমে যায়। তবু ও ধীর পায়ে বারান্দা, বটের ছায়া লক্ষ্য করে হাঁটে। ঘাড় থেকে জামার কলারটাকে আলগা করে দেয়!

এ্যাই! দাঁড়াও না। বাবা! কতো ডাকছি।

কে? রীনা?

হ্যাঁ। কি এতো চিন্তা করছো? চলো।

শুভো ওর জামার কলারটাকে ঠিক করে নেয়। রাস্তার উপরে উঠে আসে। বারান্দা, বটগাছ এরা কতটুকু ছায়া দিতে পারে?

রীনা হাঁটে।

শুভো ওর পাশে হেঁটে যায়।

মদন দাশের গল্প

খুনী

॥ এক ॥

খোলা দরজা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকছিল। শীত শীত ভাব গা কাঁপিয়ে দিলে সে চাদরটা ভাল করে গায়ে জড়াতে জড়াতে চোখ মেলে তাকালো। খোলা দরজা দিয়ে প্লাটফরমের কিছুটা অংশ দেখা যাচ্ছিল, সকালের রোদ সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আনমনে কিছুক্ষণ সেই রোদ্দুরের ওপর দৃষ্টি ছড়িয়ে রাখল সে। শিথিল শরীরে কেমন এক প্রশান্তি।

একটা বিশাল ইজিচেয়ারে শুয়েছিল সে। রাত্রে চেয়ারটার মুখ দরজার দিকে ফিরিয়েছিল, তাতে এই বিশাল ঘরটির একটা ছোট অংশের সে অংশীদার হ'য়ে গিয়েছিল। তার পেছনে পড়েছিল বাকি ঘর, সেটা সে এ দম্পতির জন্য ছেড়ে দিয়েছিল। কাল মাঝ রাত্রে যখন সে ট্রেন থেকে নেমেছিল তখন তার সঙ্গে আর দুজন মাত্র যাত্রী নেমেছিল—এ দম্পতি—সম্ভবতঃ অল্প কিছুদিন আগে বিয়ে হয়েছে, তাদের অসুবিধার কথা চিন্তা করে সে চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিয়েছিল।

দরজা খুলল কে?—প্রশ্নটা মনে আসতে সে ঘাড় ফিরিয়ে ভেতরের দিকে তাকালো এবং দেখল বৌটি কি যেন গোছগাছ করছে, স্বামীটি নেই। সে উঠলো, চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিল, পাজামা হাঁটুর কাছে কুঁচকে গিয়েছিল—নীচু হ'য়ে একটু টানটান করার চেষ্টা করলো তারপর ধীর পায়ে বাইরে এসে দাঁড়ালো।

দীর্ঘ প্লাটফরমে ঝলমল করছে শান্ত রোদ। বিশাল কয়েকটি শিরীষ গাছ গম্ভীর দাঁড়িয়ে। সে আরেকটু এগিয়ে প্লাটফরমের ধারে এলো। ফিরে ফিরে দেখলো ষ্টেশন বাড়ী, দেখলো গাছেদের, দেখলো ওভারব্রীজ—ওভারব্রীজের মাথায় কি একটা পাখী ডেকেই চলেছে। তার মিষ্টি কণ্ঠস্বর স্তব্ধ প্রায় নির্জন পরিবেশকে মুখরিত করছিল। শেষ রেল লাইনে একটি দীর্ঘ মালগাড়ী দাঁড়িয়ে আছে সুতরাং ওপাশের কিছু দেখা যাচ্ছে না।

সে আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করলো। পায়ের নীচে শিরীষের ছোট ছোট ঝরাপাতা আর শিশির মাখামাখি, সেই শিশির আর শুষ্ক পত্ররাশি দেখতে দেখতে দলতে দলতে খেলতে খেলতে সে হাঁটছিল।

…অনেকদিন আমি এরকম প্রশান্তি অনুভব করিনি…সত্যি, কাল রাত্রে এই আরাম কেদারায় আধশোয়া অবস্থায় আমি যেরকম সুখনিদ্রা দিয়েছি এরকম সুখময় নিদ্রা আমি কতদিন পাইনি ?

সে চোখ তুলে আকাশ দেখল, দীর্ঘ টানে বুক ভর্তি করল বাতাসে।…ঠাণ্ডা বাতাসে।…ঠাণ্ডা বাতাস খুব ভাল লাগবে…খুব…

সামনে রাতের সেই সঙ্গী-দুহাতে দু ভাঁড় চা নিয়ে পাটি পাটি করে হাঁটছে। চোখে চোখ পড়তে হাসল। ভাঁড়ের চা একটু একটু চলকে আঙুলে লাগছে।

—খুব গরম,—বোকার মতো বললো লোকটি, আমার অতো চা চা নেই, কিন্তু আমার বউ-সকালেই চা-টি না খেলে মাথা ধরে জানেন।

সে ঈষৎ হাসল…আমার বউ, আমার বউ। নতুন বিয়ের পর সবাই ওরকম করে হে। অতো আদিখ্যেতা দেখিওনা বাছা! তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে। মাত্র দুবছর আগে আমারও ওরকম মনে হ'তো। মনে হ'তো বউ যদি চাঁদ চায় তাও এনে দেবো। তা চাইতে চাইতে এখন এমন অবস্থা যে গত তিনমাস ধরে আমার নাওয়া খাওয়া ঘুম বন্ধ হ'তে চলেছে…। নাক মুখ কুঁচকে একটা বিকৃত মুখভঙ্গী করল সে।…আমার বউও এখন তার দেশ-প্রিয় পার্কের বাপের বাড়ীতে নিশ্চয় খুব আরাম করে বিছানায় আধশোয়া হ'য়ে চা পান করছে…।

—দূর। দূর।—সে কি যেন তাড়াতে চাইলো,—আর বেড়িয়ে কাজ নেই, বাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়াই ভালো, ষ্টেশনের বাইরে একটা সাইকেল রিক্সা নিতে বলেছে বিজয়েন্দু।

সহসা ঘটাং ঘট্, ঘটাং ঘট্ করে মালগাড়ী চলতে শুরু করেছে। সে দাঁড়িয়ে পড়ল। ক্রমশঃ গাড়ীর গতি বাড়ছে।

…এখনই সামনের আড়াল সরে যাবে…ওপাশের দৃশ্য কেমন?—সে খুব উদগ্রীব হ'য়ে উঠছিল এবং এক সময় গাড়ী চলে গেলে সে দেখল সামনে সবুজ বিশাল প্রান্তর ঢালু হ'য়ে গড়িয়ে গিয়ে আবার ক্রমশঃ উঁচু হ'য়ে গেছে। প্রান্তরের শেষে নীল পাহাড়েরা গলাগলি করে দাঁড়িয়ে।

…ওই দূরে ওটা কি একটা নদী? চিক্ চিক্ করছে? হাঁটতে হাঁটতে ওই নদীর কাছে—কিংবা আরও দূরে নদী পেরিয়ে ওই পাহাড়ের মেলায় চলে গেলে?

গায়ের চাদর খসে পড়ে যেতে চাইলে সে প্রকৃতিস্থ হ'লো, ওয়েটিং রুমের দিকে ফিরল।

ঘরের ভেতর খুব গোছগাছ চলেছে—সে তার একমাত্র সুটকেসটি তুলে নিলো, বেরিয়ে এলো।

ষ্টেশন রোডের দুপাশে বাড়ি ঘর ভাঙা রাস্তা নোংরা নর্দমা দোকান পাট গরু বাটাল ক্রমশঃ সরে যেতে যেতে এক সময় সাইকেল রিক্সা দুপাশে ধান ক্ষেত নিয়ে ছুটছিল।

…এ যেন সেই তেপান্তরের মাঠ। ওই দূরে নীল পাহাড় যেন সেই স্বপ্নপুরীর বেঙ্গমা বেঙ্গমীর দেশ, যেখানে ঘোড়া ছুটিয়ে যায় রাজপুত্তুর…সেখানে ফুলের দেশে প্রজাপতি ওড়ে আর পাখীরা গান গায়…বিমলেন্দু বলেছিল…খুব শান্তি…

বাঁদিকে দূর থেকে ক্রমশঃ এগিয়ে আসছিল একটা ছোট্ট পাহাড়—টিলাই বলা যায়—দীর্ঘ সব গাছেরা তার ওপর দাঁড়িয়ে যেন চারপাশে তদারকি করছে—এর নীচ দিয়ে রিক্সা বাঁক নিলো। লাল মাটির পথ, দুপাশে শালবন। গাছেদের ফাঁক দিয়ে আলোছায়ার লুকোচুরি। বাতাসে কেমন একটা অদ্ভুত গন্ধ অনুভব করলো সে। আর একটু এগিয়ে রিক্সা থামলো, রিক্সাওলা বললো,—এই বাংলো। …বিমলেন্দু বলেছিল…খুব নির্জন…

নির্জন-প্রায় বনভূমি—এখানে এখন সে সুটকেশ হাতে একা দাঁড়িয়ে। রিক্সা চলে যাওয়ার সামান্য শব্দটুকুও মিলিয়ে গেল। এখন শুধু প্রকৃতির মৃদু শব্দ—গাছেদের, পাখীদের,—কেমন একটা শিরশির উত্তেজনা তার শরীরে জমে উঠছিল।…অদ্ভুত লাগছে…সত্যি…

অনেকগুলি সিঁড়ি ভেঙে উঠে এলো সে, উঁচু বিস্তৃত চত্বরের ওপর বড় বড় থামওয়ালা বারান্দা। সামনে দুপাশে দুটি থামের গায়ে মার্বেল পাথরে খোদাই—'মাধবী ভিলা—বনবিহারী রায়'—পড়ে ফেলল, বারান্দা পেরিয়ে বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়ালো। এদিক ওদিক তাকিয়ে কাউকে দেখা যায়না, সব জানালাগুলিও বন্ধ।

বিমলেন্দু বলেছিল একজন কেয়ার-টেকার আছে, বাংলোর একদিকে একটি ঘরে সে তার বউ নিয়ে থাকে। বলেছিল,—আগে দেখাশোনা করত এক বুড়ো, সে মারা গেছে, এ তারই ছেলে—কি নাম যেন—হ্যাঁ—হেমন্ত সিং। দরোজার বড় বড় পেতলের বালা ধরে নাড়া দিলো সে। ডাকলো,—হেমন্ত সিং।

অনেকক্ষণ ধরে থেমে থেমে কড়া নাড়িয়েই চলেছিল, কোনো সাড়া শব্দ নেই, অগত্যা সে দুহাত দিয়ে দরজায় ধাক্কা দিলো কয়েকবার আর ঠিক তখন কে যেন তার পেছন থেকে বললো—কে আপনি? সে চমকে ফিরে তাকালো।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে আছে যে তাকে সে দেখলো। তার গায়ের রঙ আষাঢ়ের মেঘের মতো কালো, মাথায় বাসি বিনুনী—রুক্ষ চুলে ফুলে ফেঁপে এলোমেলো হ'য়ে আছে, সিঁথিতে আবছা সিঁদুর। সে ঈষৎ দীর্ঘাঙ্গী এক যুবতী, তার স্বাস্থ্যের লাবণ্যে চোখ রাখা দায়।

—আমি কলকাতা থেকে আসছি—তার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে চাইলো সে কিন্তু সেখানেও দৃষ্টি রাখা দায়, কি যেন শানিত উজ্জ্বলতায় তার চোখ দুটি উজ্জ্বল। সোজাসুজি চোখে চোখ না রেখে সে তার ঠোঁটের ওপর গালের ওপর দৃষ্টি রেখে কথা বললো—আমি কয়েকদিন এখানে থাকবো। এ বাড়ীর মালিক বিমলেন্দু রায় আমার বন্ধু, আমাকে বলেছিল হেমন্ত সিং এ বাড়ীর দেখাশোনা করে, কিন্তু অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করছি— ও।—বলে আরেকটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো সে যেন কিছু যাচাই করতে চাইছিল। পরনে তার ধপধপে সাদা লালপাড় মোটা শাড়ী, আঁচল কোমরে জড়ানো, তার ডানহাতে একটা পেতলের বড়ো ঘটি—সোনার মতো ঝকঝকে কানায় লেগে আছে দু-চার ফোঁটা দুধ। ঘটির কানা আঙুলে ধরে ঝুলিয়ে রেখেছিল সে।

সে অবাক চোখে মেয়েটিকে দেখছিল। তার পর্যবেক্ষণরত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, তার পাতলা ঠোঁটের দৃঢ় ভঙ্গী অথচ কি মসৃণ চিকন পেলব তার গাল শিশুর মতো।

—আপনি একা এসেছেন? হঠাৎ প্রশ্ন করল সে।

সে ঘাড় নেড়ে স্বীকৃতি জানালো।

—চাবি এনেছেন?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ,—সে তাড়াতাড়ি নীচু হয়ে বসে সুটকেশ খুলল (বিমলেন্দু বলেছিল চিঠিপত্র লিখে দেওয়ার দরকার নেই, সব ঘরেরই দুটো করে চাবি আছে। এখানের চাবি খুলে এরা ঘরটর পরিষ্কার করে গুছিয়ে রাখে, কলকাতা থেকে যে যখন আসে চাবি নিয়ে আসে, তাহলে এরা বুঝতে পারে যে বাবুরা পাঠিয়েছেন···সম্ভবতঃ এটিই হেমন্ত সিং এর বউ···বাবাঃ।)

সুটকেশ খুলে জামাকাপড়ের তলায় হাত চালিয়ে খোঁজাখুঁজি করে সে চাবি পাচ্ছিল না।

—এখানেই তো রেখেছিলাম, কোথায় গেল,—সে অস্ফুটে বললো।

—আহা! জামাকাপড়গুলো যে আপনি সব লাটখাট করে ফেললেন—ব্যস্তগলায় বলে সে, দ্রুত এগিয়ে এসে ঘটিটা রেখে হাঁটু মুড়ে বসে, প্রায় প্রণাম

করার ভঙ্গী। সুটকেশ থেকে জামা-কাপড়গুলি সে একটি একটি করে কোলের ওপর সাজিয়ে রাখে।

সব জামাকাপড় তুলে নিলে সুটকেশে পড়েছিল মাজন, টুথব্রাস ইত্যাদি টুকিটাকি এবং এককোণে চাবিটি।

—ঐত চাবি—সে তাড়াতাড়ি চাবি তুলে নিয়ে ওর দিকে তাকায়।

খুবই কাছাকাছি বসেছিল তারা, চোখে চোখ পড়তে কেমন একটা লজ্জার ছায়া পড়ে মেয়েটির চোখে, তাড়াতাড়ি নীচু হ'য়ে সে জামা কাপড়গুলি সুটকেশে গুছিয়ে তুলতে থাকে।

—তুমি কি হেমন্ত সিং এর বউ? সে প্রশ্ন করে। মেয়েটি ঘাড় নাড়ে, ছোট্ট উত্তর দেয়—হুঁ।

—কি নাম তোমার?

—লীলাবতী,—বেশ সহজ গলায় উত্তর দেয় সে।

—হেমন্ত কোথায়?

হঠাৎ ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মতো সোজা হ'লো মেয়ে, চোখদুটি জ্বলে উঠল যেন, বলল—ছোটবাবু অনেক দিন আসেন নি, বাবু জানেন না তার কেরার টেকার হাঁড়ি হাঁড়ি মহুল গেলে। সে কি এবাড়িতে থাকে? না কিছু দেখে?

সুটকেশটা বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালো সে, একহাতে সুটকেশ অন্যহাতে ঘটিটা তুলে নিয়ে বললো—আসুন।

॥ দুই ॥

নমিতার সঙ্গে তুমুল ঝগড়া হচ্ছিল। নমিতা যখন ঝগড়া করে তখন তার মুখটা হিংস্র জন্তুর মতো দেখায়—কি কুৎসিত লাগে। তখন একটা ধারাল ব্লেড দিয়ে ওর মুখটাকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে ইচ্ছা হয়।

নমিতা তীক্ষ্ণ গলায় কথা বলছিল এবং সে খুবই চোখা চোখা কিছু উত্তর দিতে চাইছিল। কথাগুলি বুকের মধ্যে সব ধাক্কাধাক্কি করছিল কিন্তু কিছুই মুখে আসছিল না সুতরাং সে ক্রমশঃ উত্তেজিত হচ্ছিল।

…এরকমই হয়। আঃ। যখনই নমিতা ঝগড়া করে তখনই তীক্ষ্ণ সব ব্যঙ্গ বিদ্রূপপূর্ণ বাক্যে আমাকে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে মারে অথচ আমি কিছুই বলতে পারি না…অথচ অনেক কিছু বলতে চাই…আঃ।…

ছট্‌ফট্‌ করতে করতে তার ঘুম ভাঙল। ঘর প্রায় অন্ধকার···বাইরে কি নমিতা চিৎকার করছে?···কেন?···

সে বিছানা থেকে নামল। টেবিলের ওপর সেজবাতি—শিখা কমানো ছিল—বাড়িয়ে দিলো।···চিৎকারটা বাড়ীর ভেতর দিকেই মনে হচ্ছে···এখানে নমিতা কোথা থেকে আসবে? তাহলে কি লীলাবতী?—ভেতর দিকের দরজা খুলে সে বারান্দায় বেরিয়ে এলো। উঠোনের ওপারে কেয়ারটেকারের ঘর, পাশে রান্নাঘর। রান্নাঘরের পাশে উঠোনের ওদিকে একটা দরজা, সেখানে লীলাবতী একটা হ্যারিকেন নিয়ে দাঁড়িয়ে। দরজা খোলা বলেই মনে হ'লো তার। লীলাবতী তীক্ষ্ণ গলায় কাকে যেন কেটে কুচি কুচি করবে বলে শাসাচ্ছিল, সে সম্ভবতঃ বাইরে দাঁড়িয়ে।

বারান্দা থেকে নেমে সে দুপা এগিয়ে দাঁড়ালো। সত্যিই ওর ডান হাতে একটা চকচকে দা, সে দা-সমেত হাত তুলে আগন্তুককে চলে যেতে নির্দেশ দিলো, সে বললো ফের যদি দরোজায় ধাক্কা শুনি তাহলে আমি ঘাড় থেকে মাথা নামিয়ে দেবো দেবো,—বলে হ্যারিকেন আর দা নামিয়ে রেখে সে দরজায় খিল দিলো, তারপর ঘুরে হ্যারিকেন তুলে নিতে গিয়ে চমকে তাকালো। হাতটা হ্যারিকেনের মাথায় ধাক্কা দিয়েছে, শিখা দপদপিয়ে সেটা উল্টে পড়ে নিভে যায়, গভীর অন্ধকারে সব কিছু ডুবে যায়। কিছুই দেখতে পায় না সে।

—কে এসেছিল? তোমার স্বামী?—অন্ধকারের উদ্দেশ্যেই প্রশ্ন ছোঁড়ে সে।

কোন উত্তর নেই! যেন ফোঁপানির শব্দ শোনে সে। দুপা এগিয়ে যায় সে—ও কি কাঁদছে?—বিমূঢ় হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে, কি করবে ভেবে পায়না। থমথমে অন্ধকারে ডুবে আছে চরাচর—সে দেখে। পেছনের বাগানে কয়েকটি দীর্ঘদেহ গাছ ঘুমে থমথমে—সে দেখে। খুব অসহায় লাগে তার।

—লীলাবতী, তুমি কাঁদছ?—অসহায় গলায় জিজ্ঞাসা করে সে। লীলাবতী ফুঁপিয়ে ওঠে—এই অশান্তি আমি আর সহ্য করতে পারিনা—রাতের পর রাত আমি ঘুমোতে পারিনা—থেমে থেমে করুণ গলায় বলে সে—আমার মাথা দপ্‌দপ করে একা এই বিরাট বাড়ীটায়—একদিন আমি পাগল হ'য়ে যাবো।

অন্ধকারে তার কষ্ট হয়। এই অন্ধকার কি বিশাল, ভারী হ'য়ে বুকে চেপে আসে যেন।—কেঁদোনা, তুমি কেঁদোনা,—করুণ গলায় বলে সে।

···দুঃখ ভুলতে আমি ভালো এক দুখীর কাছে এসেছি—ভাবতে ভাবতে বাঁকা হাসি ফোটে তার ঠোঁটে—আমাকেই এখন সান্ত্বনা দিতে হচ্ছে।

তবু এই সান্ত্বনা দিতে তার কেমন ভাল লাগে। হাতড়ে হাতড়ে বারান্দায় ওঠে, দরজার পর্দায় আলোর আভাস। ঘরে গিয়ে বাতিটা তুলে নেয়, আস্তে আস্তে উঠোনে এসে দাঁড়ায়।

হাঁটুতে মুখ গুঁজে লীলাবতী কোঁপায়। সে নেতা হ্যারিকেনটা অন্য হাতে তুলে নেয়, একটু ইতঃস্তত করে, সঙ্কোচের সাথে বলে—আমার ঘরে এসো, হ্যারিকেনটা ঠিক করো।

ঘরে এসে সে খাটে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়, মেঝেতে বসে ও হ্যারিকেনের কাচ খুলে জ্বালে, স্বল্পালোকে ওর কান্নাভেজা মুখ দেখে সে মায়া লাগে।

—নেশা করে ও পয়সা কোথায় পায় ?—জিজ্ঞাসা করে সে।

—পয়সা ?—সে একটু হাসে—ষ্টেশনের কাছে ওর একটা চায়ের দোকান আছে! সেটাও ভালো চালায় না। একটা ছেলেকে রেখেছে সে, যেরকম খুশী চালায়। ও খালি আসে পয়সা নিতে! ছোটবাবুও কোলকাতা থেকে মাসে মাসে টাকা পাঠাচ্ছেন।

হাঁটুতে চিবুক রেখে উবু হ'য়ে বসে ছিল লীলা। এখন আর কাঁদছিল না। আঁচল দিয়ে মুখ মুছল ও, উঠে দাঁড়িয়ে হ্যারিকেনটা হাতে নিলো তারপর সজল চোখে একবার তাকিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল।

খুব মন খারাপ লাগে তার। স্তব্ধ চরাচর। সে একা। নিঃসঙ্গতা কি বিশাল মনে হয় তার। দরজা বন্ধ করে সে। আলোটা কমাতে গিয়েও হাত গুটিয়ে নেয়। কেমন যেন ভয় লাগে তার। চাদরটা টেনে নিয়ে গায়ে জড়ায়।

আজ সকাল থেকে সন্ধ্যা থেকে রাত—ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত আনন্দে আনন্দে কেটেছে। দীর্ঘ দিনের ক্লান্তি অশান্তি কষ্ট সব কোথায় হারিয়ে গিয়ে ছিল। অশান্তি যে কোন কালে ছিল একথা মনেই ছিল না তার।

কিন্তু এখন আবার তারা ক্রমশঃ চারপাশ ঘিরে তাকে বেঁধে ফেলছিল। খুব কষ্ট লাগছিল তার। খুব অসহায় লাগছিল।...ওর সঙ্গে আরও খানিকক্ষণ কথা বললে হতো ভাবে সে—ভুল হলো,...খুব ভুল হলো...।

...সারাদিন ও উৎসাহ আর আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। ওর মধ্যে যে এরকম ব্যথা আছে বুঝতেও পারা যায়নি...হয়তো ভুলে ছিল আমারই মতো...

সেই সকালবেলা সে যখন চাবি দিলো তখন ঘর খুলে ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার ঘর আরেকবার ঝাড়মোছ করেছে সে, আলমারি খুলে কাচা চাদর বালিশের ওয়াড়

বার করে বিছানা পেতেছে পরিপাটি, ঘরের সংলগ্ন বাথরুমে ইঁদারা থেকে জল এনে দিয়েছে তারপর কোমরে জড়ানো আঁচল খুলে হাসি মুখে ঘাড় কাত করে বলেছে আমি জলখাবার করতে যাচ্ছি।

তারপর সেই 'ব্রেকফাষ্ট'—প্লেটে খাবার আর চা ট্রেতে সাজিয়ে নিয়ে টেবিলে রেখেছে—হাতে গড়া রুটি, দুটো ডিমসেদ্ধ, কিছুটা আলুভাজা আর ঘন দুধের চা। সঙ্কোচ করে বলেছে পাউরুটি মাখন এসব এক্ষুনি পাওয়া মুশকিল—শুনে সে খুব হেসেছে, বলেছে, তুমি রোজ সকালে আমাকে এরকম খাবার দেবে।

—দুপুরে কি খাওয়াবে?—জিজ্ঞাসা করেছে সে—এখানে মাছটাছ পাওয়া যায়? বাজার তো মনে হয় সেই ষ্টেশনের কাছে। তোমাকে খুব অসুবিধায় ফেললাম। যার ওপর এ বাড়ীর দায়িত্ব সে-ই—যাক্‌গে, তুমি যাই হোক ডাল ভাত খাইও।

—আপনাকে ওসব ভাবতে হবে। কোন ছেলেটেলেকে দিয়ে জিনিষপত্র আনিয়ে নিই আমি।—একটুক্ষণ চুপ করে থেকে উদাস গলায় বলেছে—আপনারা এলে আমার যে কি ভাল লাগে! এইসব বড় বড় ঘর খালি পড়ে থাকে, ঝাড়মোছ করি, গোছগাছ করি, সারাদিন একা এই খাঁ খাঁ বাড়িটায়—এক একসময় দমবন্ধ হ'য়ে আসে—বিষণ্ণ কণ্ঠস্বর তার বইয়ের আলমারির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে, যেন শরীরের ভর রেখেছে, কোন্ দূর থেকে যেন ফিস্ ফিস্ করে বলেছে—বাগানে যাই, গাছপালাদের দেখিশুনি, গরু বাছুরটার কাছে, মুরগীগুলোর সঙ্গে কথা বলি···এক একদিন এমন যায় সারাদিন একটাও কথা বলা হয়না,···

শুনতে শুনতে তার নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হ'য়ে এসেছে। এই অদ্ভুত পরিবেশ, এই নির্জনতা, এই বনভূমির শিরশির শব্দ, এই বুনোগন্ধ বাতাস—বুকের মধ্যে কেমন থম্ থম্। এ যেন কোন নিঝুমপুরীর বন্দিনী সম্মোহিতের মতো মনে হ'য়েছে তার।

সহসা থমকেছে লীলা—এ মা, আমি কতো বক্‌বক্ করছি। ছিঃ। ছিঃ। কাউকে পেলে আমি এতো বক্‌বক্ করি! কথা না বলে বলে আমার যে কী হ'য়েছে।—দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে সে।

তখন চারপাশে আশ্চর্য নীরবতা। শুধু দূর থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসে কি যেন পাখীর ডাক। বাতাসে গাছপালার বুনো গন্ধ তীব্র হ'য়ে ওঠে। একটা তৃপ্তির ভাব ছড়িয়ে যায়। একটু পরে ওঠে সে, উঁচু গলায় বলে,—টেবিলে টাকা রইল বাজারের জন্য, আমি বেড়াতে বেরুচ্ছি।

দুপুর বেলায় : আমি সেই কখন থেকে রান্না করে বসে আছি। এই মাঠে মাঠে আর বনে জঙ্গলে কি দেখার আছে আমি বুঝিনা।

—কেন, সেই নদীর ধারে গিয়েছিলাম।

—সেই অতোদূরে ? নদীতেই বা কি দেখবার আছে ?

—সে তুমি বুঝবেনা।

—আমার বুঝে কাজ নেই।

ইঁদারার ঠাণ্ডা জলে স্নান···জলে পাথুরে গন্ধ।

আহার।

—এতো খাবার ? আমি কি রাক্ষস নাকি ?

—তা কেন ? কিন্তু এখানের জলে রাক্ষস আছে, জল খেলেই সব হজম হ'য়ে যাবে।

···স্নান করা এলো চুল···ডুরে তাঁতের শাড়ী···কাচের চুড়ি পরা সুডৌল··· হাত···শান্ত দৃষ্টি···ওর কথাবার্তা চলাফেরা ব্যবহার সব কিছুতে এমন সৌন্দর্য এমন ভব্যতা যে ওকে যথেষ্ট অভিজাত মনে হয়, একটা মাতাল কেয়ারটেকারের গ্রাম্য বউ বলে মনেই হয়না···ও কি এখন ঘুমোচ্ছে ?···আমার ঘুম আসছেনা··· কি নিঃস্তব্ধ রাত্রি !···মনে হয় এই বিশাল পৃথিবীতে আমি একমাত্র জীবন্ত প্রাণ।

···এখন রাত কতো ? ঘড়ি দেখলে হয়তো সময় জানা যাবে, কিন্তু লাভ কী···লীলাবতী তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছ···?

তিন ॥

কি একটা শব্দে ঘুম ভাঙল তার। বুঝতে কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগল, তারপর তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে বাইরের দিকে জানালা খুলল। শব্দটা জানালার খড়খড়ির, সম্ভবতঃ কেউ খড়খড়ি তুলে—হ্যাঁ সিঁড়ি ভেঙে দ্রুতপায়ে একটা লোক রাস্তায় পড়ল তারপর প্রায় ছুটতে ছুটতে চলে গেল।

হতভম্ব সে কতক্ষণ জানালায় দাঁড়িয়েছিল নিজেই জানেনা, সম্বিত ফিরল যখন—দেখল ঝকঝকে সেই ঘটি হাতে লীলাবতী রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসছে। সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে তাকালো, একটু হাসল, এতটা দূর থেকেও সে বুঝতে পারছিল একটা বিষণ্ণ ছায়া লীলাবতীর মুখ ঢেকে রেখেছে।

বাড়ীটাকে বেড় দিয়ে একটা সরু পায়ে-চলা পথ পিছনের দরজার দিকে চলে

গেছে। গতকাল সেই দরজার তালা খুলে তারা বাড়ীতে ঢুকেছিল। সেই সরু রাস্তা ধরে মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে চলে যায় লীলা। তার মনটাও বিষণ্ণ। জানালার ভর দিয়ে সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে, দাঁড়িয়েই থাকে।

খাওয়ার টেবিলেও কোন কথাবার্তা নেই। লীলাবতী খাবার সাজায়, সে দেখে। ওকে খুব ক্লান্ত মনে হয় তার। সম্ভবতঃ রাত্রে ও একটুও ঘুমায়নি। আন্তরিক কিছু কথা লীলাকে বলতে ইচ্ছা হয় তার, কিন্তু কি বলবে কিছুই ঠিক করতে পারে না।

—তুমি চা খাবেনা ?—একটু ভেবে নিয়ে বলে সে।

—হ্যাঁ খাবো।

—তাহলে যাও, খেয়ে নাও, শুধু শুধু দাঁড়িয়ে থাকার দরকার নেই। একটু ইতঃস্ততঃ করে লীলাবতী।

—যাও।—অনুরোধ করে সে। ম্লান চোখে লীলাবতী একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকে তারপর চলে যায়। সে দেখে। সত্যিই ও খুব ক্লান্ত,—ভাবে সে।

নিঝুম ঘরে চুপচাপ বসে থাকে সে। বাইরে সকালের রোদ্দুর ক্রমশঃ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠছে—দেখে, গাছেদের পাতা পড়ে,—দেখে, কিচ্‌মিচ্‌ করে পাখীরা,—শোনে, আর সারাক্ষণ লীলার ম্লান দৃষ্টি শুকনো মুখ ভেসে থাকে বুকের মধ্যে। হঠাৎ মনে হয় আজকেও যদি ও নানা রকম রাঁধতে বসে ? না, বারণ করা উচিত।

উঠানে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিকে কোথাও দেখতে পায়না সে। ওর ঘর, রান্নাঘর দুটো ঘরই শেকল তোলা। বাগানের দিকের দরজাটা খোলা দেখা যাচ্ছে। পায়ে পায়ে দরজা পেরোয়।

...এই তাহলে বাগান। বাগান না বনভূমি। সীমানা কিছু দেখা যায়না। লাল কাঁকুরে রাস্তা ধরে পায়ে পায়ে এগোয় সে। রাস্তার দুপাশে মেহেদীর ঝাড় ইচ্ছামতো বেড়ে বেড়ে এলোমেলো হ'য়ে গেছে। এককালে হয়তো সুন্দর করে ছাঁটা হ'তো। ইতস্ততঃ বিশাল সব বয়স্ক গাছেরা। আরেকটু এগিয়ে রাস্তার মাঝে শ্বেতপাথরের একটা গোল বেদী পেলো সে, চারপাশে গোলাপের ঝাড়—অযত্নে খেয়ালখুশী মতো বেঁচে আছে মনে হয়, কোনক্রমে দুচারটে ফুল ফুটিয়েছে।

বেদীর কাছে এসে একটু দাঁড়াল সে। সামনে গাছপালার আড়ালে ঘরটরের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। পায়ে পায়ে সে এগিয়ে যায়।

বাছুরটা দুধ খাচ্ছে, গাভীটি চোখবুজে মুখ উঁচু করে আছে, তার ঝরা চুল

শুকনো মুখ একটুও পরিবর্তিত হয়নি। লীলা প্রায় চমকে ওঠে—আপনি? —তোমাদের বাগান দেখতে এলাম,—হাসি হাসি মুখে বলে সে, আবহাওয়া স্বাভাবিক করতে চায়।

—আর বাগান!—হতাশ গলায় বলে লীলা, ম্লান হাসে,—মাত্র দুবছরে বাগানের কি হাল হ'য়ে গেছে। শ্বশুর আমার চোখ বুজেছে আর—!···বিয়ের পর যখন আমি এ বাড়ীতে এলাম তখন সব কিছু সুন্দর ছিলো। ঐ শ্বেতপাথরের বেদী—আঙুল তুলে দেখায় সে—ওর চারপাশে গোলাপ থৈ থৈ করত। রোজ বিকালে মামণি ওখানে বসে আমাকে কতরকমের ফুল বেঁধে দিতেন। কত গল্প করতেন, কথা বলতে শেখাতেন—আমিতো একটা গাঁইয়া ভূত ছিলাম তখন—সেই আমাকে একেবারে মেয়ে করে নিয়েছিলেন—বলতে বলতে দৃষ্টি স্বপ্নময় হ'য়ে যায় তার, যেন সেই হারানো দিনে ফিরে যায় সে।

—মামণি কে? জিজ্ঞাসা করে সে।

—ছোটবাবুর মা! মামণি তখন এবাড়ীতে, শরীর খারাপ ছিল, হার্টের অসুখ এখানেই থাকতেন। আমি কতো যত্ন করতাম। ওঁর মেয়ে নেই, আমাকে বলতেন শেষ জীবনে আমার এমন মেয়ে হ'লো। কি আদর—বলতে বলতে ঠোঁট কাঁপে তার, চোখ ছলছল।

—এই, এই, তুমি কি কাঁদবে নাকি? দেখোতো।—সে ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে। তারও চোখ কেমন ছিপ্‌ছিপ করে।

ও সামলে নেয়, বলে, বড়বাবু দশ পনেরো দিন অন্তরই আসতেন, দু একদিন থাকতেন, দেখেশুনে যেতেন। ছোটবাবু বৌদিকে নিয়ে মাঝে মাঝে আসতেন। টেলিগ্রাফের ডাক্তারবাবু প্রত্যেক সপ্তাহে এসে দেখে যেতেন। তবু মামণির অসুখ বাড়লো, বড়বাবু অপারেশন করাতে কলকাতায় নিয়ে গেলেন, মা আর ফিরলেন না।···তিনিও গেলেন আর আমারও কপাল পুড়লো। আগে ও লুকিয়ে লুকিয়ে নেশা করত তারপর থেকে ভর গেল। আর শ্বশুর মারা যাওয়ার পর—···এখন আমি ওকে একদম সহ্য করতে পারিনা, কি করব আমার কেমন ঘেন্না করে। ও না এলে আমি অন্ততঃ স্বস্তিতে থাকি।—যাক্‌গে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে সে,—সবসময়ই আপনাকে আমরা দুঃখের কথা শোনাচ্ছি। আপনি এসেছেন দুদিনের জন্য বেড়াতে।—সে স্বাভাবিক হ'তে চায়, রুক্ষ দীর্ঘ বিনুনী টেনে নিয়ে অভ্যস্ত আঙুলে খুলতে থাকে।

—দুঃখের কথা কাউকে বলতে পারলে মনটা একটু হাল্‌কা হয় লীলা—

উদাস গলায় বলে সে,—আমারও অনেক দুঃখ, জানো। এই যে আমি একা একা,—হঠাৎ কথা থামিয়ে অন্য কথায় চলে যায় সে,—হাঁটতে হাঁটতে অনেকদূর চলে এলাম। কতো বড়ো বাগান?

—আপনার আবার কিসের দুঃখ?—লীলা কিন্তু ধরিয়ে দেয়।

—বউকে নিয়ে অশান্তি, আবার কি।

—কেন, আপনার বউকি নেশা করে নাকি?—লীলা হাসে।

—তা নেশাই বলতে পারো, তার আলাদা ফ্ল্যাটের নেশা,—সেখানে—স্বাধীনতা, ইচ্ছামতো বন্ধুদের সাথে হৈ-হল্লোড়—এইসব। আমি কিন্তু একটু ঘরকুনো, শান্তিপ্রিয় মানুষ—

—ফ্ল্যাট্ কি?—বাধা দেয় লীলা!

সে স্নেহের হাসি হাসে, যেন একটা ছোট্ট মেয়ে অদ্ভুত কিছু প্রশ্ন করে ফেলেছে,—ফ্ল্যাট্ মানে ছোট্ট বাসা, একটা কি দুটো ঘর, রান্নাঘর, বাথরুম, খাবার জায়গা—এক ছাদের নীচে ছোট্ট একটুরো ব্যবস্থা আর কি উঠোন বলতে নেই, ছাদ নেই, হাত পা ছড়াবার জায়গা নেই,—বলতে বলতে একটু দম নেয় সে, তারপর,—আমাদের বাড়ীটা বেশ বড়ো জানো, সেখানে আমরা তিন ভাই, বৌদিরা, ভাইপো ভাইঝি, বাবা মা, আর আমার দু'বোন সবাই মিলে একসঙ্গে থাকি, একসঙ্গে খাইদাই আনন্দ করি। তাদেরের মধ্যে আমি ছোট। আমাকে সবাই খুব ভালবাসে—বলতে বলতে অন্যমনস্কভাবে সে চুপ করে যায়,—কিসের যেন শব্দ পাওয়া যাচ্ছে?—জিজ্ঞাসা করে।

—বাগান শেষ হ'য়ে গেলো,—লীলা বলে,—এখানে একটা ছোট্ট নদী আছে। যে বড় নদীতে আপনি বেড়াতে গিয়েছিলেন সেই নদীতে গিয়ে পড়েছে।

জমিটা ক্রমশঃ ঢালু হ'য়ে গেছে। এখানে গাছপালা বেশ নিবিড়। এলোমেলো কয়েকটি বড়ো বড়ো পাথরের মাঝে গিয়ে পথ শেষ হ'য়ে গেল।

এখন তারা দুজন একটা বড়ো পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে, সামনে নদীখাত। নদীর আগমন ও প্রস্থান যতটুকু চোখে পড়ে সবটুকুই বড়ো বড়ো পাথরের খাদ। পাথরের ফাঁক দিয়ে দিয়ে শীর্ণ জলধারা বয়ে যাচ্ছে কিন্তু তীব্র তার গতি। তত্র ফেনোচ্ছ্বাস শিউরে উঠছে, পাথরে পাথরে শব্দ তুলছে শির্‌শির্। ওপারে গভীর বন। এই নির্জন বনভূমিতে সব কিছুর ওপর ছেয়ে আছে নদীর গুঞ্জন।

তারা কথা বলছিল না। সে ঘাড় ফিরিয়ে একবার বাগানের দিকে তাকালো—কিছু দেখা যায় না, ঢালু জমি বেয়ে তারা অনেকটা নীচে নেমে এসেছে। সূর্য

ফিরিয়ে সে ওপারের বনভূমি দেখল, মনে হ'লো পৃথিবীর শেষ জনবসতির প্রান্তে এসে তারা দাঁড়িয়েছে।

এই নির্জন বনভূমি, আকাশ শিলাময় ঘাত তীব্র জলধারা দেখল সে, দেখল নিবিড় প্রকৃতি। দেখতে দেখতে তার স্নায়ু জুড়ে তীব্র স্পন্দন।···এক আশ্চর্য আবেগ বুকের ভেতর, এক অদ্ভুত উত্তেজনা···রক্তে নতুন কিছু চঞ্চলতা, ··বুকের মধ্যে কোথায় যেন ঘণ্টা বাজছে, সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে ধ্বনি···

সে লীলার দিকে তাকালো। লীলা ও সে এক পা আগে পিছে দাঁড়িয়ে। লীলার রুক্ষ এলোচুলের রাশ গালের একপাশ চিবুক গ্রীবা, নিঃশ্বাসে স্পন্দিত বুক ···লীলাবতী···ও এই নদীর মতো···কিংবা এই বনভূমির মতো···লীলা এই প্রকৃতির অঙ্গ ··

সহসা লীলা মুখ ফেরালো, দৃষ্টি কেঁপে গেল তার, নিঃশ্বাস দ্রুততর। খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল তারা, ফিরতে গিয়ে শরীরে শরীরে চকিত স্পর্শ—নদীর জলধারার মতই শিহরিত হ'লো সে। কয়েকটি নিথর মুহূর্ত—লীলা হঠাৎ পা বাড়ালো যেন নেশাগ্রস্ত একরকম পদক্ষেপ তার।

নিঃশব্দে লীলার পাশে পাশে হেঁটে সে পেরিয়ে এলো বাগানের দীর্ঘ পথ। আশ্চর্য অনুভব তার শরীর মন ছেয়ে আছে।

দরজার কাছে এসে সে থমকালো, অস্ফুটে ডাকলো—লীলা!

লীলা কথা বললো না শুধু মুখ তুলে তাকালো।— আজকে তুমি কিন্তু নানান রকম রান্না করতে বোসোনা, তুমি খুব ক্লান্ত, রাত্রে ঘুমোওনি। একটু ভাবলো সে—আমার খাবার টেবিলে ঢাকা দিয়ে রেখে স্নান করে খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়বে কেমন? আমি যেন এসে না দেখি যে তুমি না খেয়ে বসে আছো—বেশ আদেশের সুরে বলে সে, একটু স্নেহের হাসি হাসে, তারপর দ্রুত পায়ে রাস্তার দিকে এগিয়ে যায়।

এখন এই অনুভূতি এই অস্থিরতা এই আবেগ বুকের মধ্যে ভারী হ'য়ে উঠেছে ···বড়ো ভারী হ'য়ে উঠছে···আমি নিজে আর নিজেকে চালনা করতে পারছি না···এখন আর ঘরে নয়, এখন একা বাইরে···যদি—

আনমনে রাস্তা দিয়ে হাঁটে। গাছপালা দেখে, মানুষজন, দেখে আকাশ, দূরের নীল পাহাড় আর সবুজ বন। সবকিছু কেমন অন্যরকম মনে হয় তার। কলকাতা থেকে কেন সে চলে এসেছে এসব খুবই তুচ্ছ মনে হয়, যেন সেসব

দুদিনের জিনিষ, আসলে এখানেই পৌঁছানর কথা ছিল জীবনের এই অধ্যায়ে, সুতরাং বিগত দিন নিয়ে ভাববার কোন দরকার নেই। বস্তুতঃ সেসব ভাবনা অশান্তি ক্লেশ এসব তার মনে সামান্য ছায়াটুকুও ফেলছিল না।

হাঁটতে হাঁটতে একসময় সে দেখলো ষ্টেশন রোডের কাছে চলে এসেছে। আরেকটু এগোলেই সেই সব ঘিঞ্জি বাড়িঘর দোকানপাট দৃশ্যটা মনে পড়তেই মনটা বিরূপ হ'য়ে গেল, ফিরে যাবে ভেবে ঘুরলো, হঠাৎ মনে হ'লো—তাইতো—ষ্টেশনের কাছে চায়ের দোকান—একটু খোঁজ নিলে হয়না ?

সে ষ্টেশন রোড ধরে হাঁটতে থাকে—আরে এখানে আমাদের একটা ব্যাঙ্কও রয়েছে দেখছি।—সে এই ব্যাঙ্কেরই কলকাতার এক শাখার অফিসার। খুবই উল্লসিত হয় সে, যেন খুব পরিচিত কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাথে দেখা হ'য়ে গেছে। আহা এখানে বদলি হ'য়ে নিলে বেশ হয়—ভাবে সে।

ষ্টেশনের কাছে কয়েকটি ছোটছোট চায়ের দোকান। এর মধ্যে কোন্‌টা ? ভেবে চিন্তে একটা রিক্সাওয়ালার কাছে এগিয়ে যায়, জিজ্ঞাসা করে হেমন্তর চায়ের দোকান কোন্‌টা ? রিক্সাওয়ালা আঙুল তোলে আর আঙুলের নিশানার দিকে চোখ ফিরিয়ে সে দেখে—

দুটো সন্দিগ্ধ চোখ তাকেই এক দৃষ্টে দেখছিল। চায়ের দোকানের বেঞ্চে পা তুলে উবু হ'য়ে বসেছিল, চোখে চোখ পড়তে মুখ ঘুরিয়ে নিলো।—হ্যাঁ সকালের সেই পালিয়ে যাওয়া লোকটিই মনে হচ্ছে।

সামান্য দোকান। হাফপ্যান্ট পরা আদুল গায়ে একটা ছেলে চা তৈরী করছে, দুজন গ্রাম্য খরিদ্দার। সে এগিয়ে গেল, এক প্যাকেট সিগারেট ও দেশলাই চাইল।

—তোমার নাম হেমন্ত ?

তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে ওঠে, বলে,—হ্যাঁ—মুখ একটু পাশ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে।

—তুমি সকালে জানালা দিয়ে উঁকি দিচ্ছিলে কেন ?

উত্তর নেই।

—সাতসকালেই নেশা করেছ নাকি ?—প্রায় ধমকের সুরে কথা বলে সে।

—আপনি একা এসেছেন ?—লোকটি তার কথার উত্তর না দিয়ে খসখসে গলায় প্রশ্ন করে।

ইঙ্গিতটা সে আন্দাজ করে, গা জ্বালা করে ওঠে,—তুমি রোজই নেশা করে

বাইরে পড়ে থাকো, আমি কলকাতা গিয়ে টাকা পাঠান বন্ধ করতে বলবে তুমিতো কিছুই দেখাশোনা করোনা।

—আমি দেখিনা আমার বউ দেখে,—শুকনো গলায় বলে সে।

—তাহলে তোমার বৌ-এর নামেই টাকা পাঠাতে বলবো।—খুব রাগ হয় তার—অন্যায় করছ আবার বেয়াদপি? একটু লজ্জা নেই?

—লজ্জার কি আছে, পুরুষ মানুষ সঙ্কে বেলা একটু নেশা না করলে চলে।

এ লোকটার সাথে কথা বলাই উচিত হয়নি, ভাবে সে,—তুমি একটা লোচ্চা, একদিন তোমার বৌ-এর হাতে তুমি ঠিক মরবে—বলে সে আর দাঁড়ায় না।

—আপনিও ভুলে যেন আমার বৌয়ের গায়ে হাত দিতে যাবেন না, আপনাকেও তাহলে শেষ করে দেবে, আমার বউটা খুব ভালো,—পেছন পেছন দু'পা এগিয়েও তার কানে কথাটা পৌঁছে দেয় লোকটা।

মাথার মধ্যে ঝনাৎ করে ওঠে তার, চকিতে ফিরে দাঁড়ায়, লোকটা দ্রুতপদে চলে যাচ্ছে।

লোকটির প্রতি প্রচণ্ড বিরূপতা তার মনকে লীলার প্রতি আরও মায়ায় ভরিয়ে দেয়···লীলা, নিবিড় বনভূমির মতো তুমি···লীলাবতী নদীর মতো তুমি··· সুনীল আকাশ···দিগন্তের নীল পাহাড় তুমি···তুমি এক আশ্চর্য প্রকৃতি—অন্যমনে হাঁটতে হাঁটতে তার বুকের মধ্যে কোথায় যেন ঘন্টা বাজে, শরীরে প্রতিধ্বনিত হয় শব্দ।

চার ॥

এখন রাত্রি। চরাচরে গভীর নৈঃশব্দ। তথাপি তার বুকের মধ্যে লীলাবতী সেই তীব্রস্রোতা নদীর গুঞ্জন ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। যাওয়া হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। বালিশে মুখ গুঁজে বিছানায় উপুড় হ'য়ে শুয়েছিল সে। বন্ধ ঘরে মৃদু উষ্ণতা। টেবিলে সেজবাতির মৃদু আলো ঘরকে মোহময় করে তুলেছে।

ঘুম নেই। বালিশে মুখ ঝাঁকালো সে···কোথায় যেন ঘন্টা বাজছে···শরীরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে শব্দ···লীলা কি করছে এখন? কিরকম শান্ত মন্থর আর উন্মনা হয়েছে ও···অবোধ হরিনীর মতো দৃষ্টি···

দুপুরে লীলা তার কথা মতো খাবার চাপা দিয়ে রেখে ঘুমোতে গিয়েছিল। সে ইঁদারার ঠাণ্ডা জলে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করেছে। শরীর জুড়ে দুরন্ত অগ্নি

শিখার দাপাদাপি। খেয়ে দেয়ে একটু ঘুমোতে চেয়েছিল সে কিন্তু যে চঞ্চলতা রক্তে স্রোতের ঢল নামিয়েছে তা তীব্র হ'য়ে বইছিল। সারাক্ষণ অস্থিরতা তাকে ঘুমের গভীরে ডুবতে দেয়নি। চোখ বুজে চুপচাপ পড়েছিল সে।

ঠক্‌ঠক্ শব্দে চোখ মেলে দৃষ্টি সোজা খোলা দরজায়, সেখানে চৌকাঠে হেলান দিয়ে লীলাবতী দাঁড়িয়েছিল। চোখ চাইতে বলল, বিকেল হ'য়ে গেছে, চা আনবো ?

সে দেখলো লীলার মুখটা বেশ ভারী ভারী, ঘুমিয়েছে বেশ। স্নান করেছে, এলোচুল পরিপাটি। শান্ত বড়ো বড়ো চোখে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল লীলা,— দেখতে দেখতে তার বুকের মধ্যে রক্তস্রোত উতল—সে অসহায় বোধ করছিল।

মন্থর পায়ে চা নিয়ে এলো, লীলা যেন হাঁটতে পারছে না। হাত বাড়িয়ে চা নিয়ে ওর মুখের দিকে তাকালে চকিতে কম্পিত চোখ নামিয়ে নিলো তারপর মন্থর পায়ে বেরিয়ে গেল।

অস্থির সে তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে বাগানে, সেখানে বিকালের পড়ন্ত রোদ্দুরে শিরশিরে উত্তরে বাতাসে বিশাল সে বৃক্ষদের গম্ভীরতায় ঘুরতে এক সময় সেই লীলাবতী নদীর ধারে একখণ্ড পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল অনেকক্ষণ। সেই নিবিড় বনভূমিতে ছায়া ক্রমশঃ ঘনীভূত হচ্ছিল, হ'তে হ'তে অন্ধকার—তখন সে পায়ে পায়ে ফিরেছে। তারপর ঘরে চুপচাপ বসেছিল। একসময় খুব মৃদু গলায় পেছন থেকে লীলা ডাকলো, বললো, খাবার দিয়েছি।

খাবার সময় সে সারাক্ষণ বেপথু লীলাকে দেখেছে, যেন শিথিল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। ...তার বুকের মধ্যে ঘন্টা বাজছিল...শরীরে ছড়িয়ে পড়ছিল ধ্বনি প্রতিধ্বনি।

পাশের ঘরে খুট্‌খাট্‌শব্দ, যেন চেয়ারটা একটু টানা হ'লো, আলমারির পাল্লাটা বুঝি বন্ধ করা হ'লো—

দুই ঘরের মাঝখানে খোলা দরজায় পর্দা ঝুলছে—ওঘরে আলোর আভাস, সে উঠল, দরজার পর্দা সরালো—ওঘরে বইয়ের আলমারির কাছে লীলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে এদিকে তাকিয়ে আছে।

—লীলা, এখানে এসো, গল্প করি—ঘুম আসছে না—মৃদু গলায় বলে সে, কণ্ঠস্বরে আর্তি।

লীলার পায়ে পায়ে জড়িয়ে যায়, ঘরটুকু পেরিয়ে আসতে পারে না যেন। এ ঘরে এসে খাটের বাজুতে ভর দিয়ে দাঁড়ায়।

সে খুব কাছে এসে দাঁড়ায়, দেখে নিবিড় এলোচুল, দেখে ছোট্ট কপাল, দেখে আঁখিপল্লব, তীক্ষ্ণ নাসা, পেলব গাল, চিবুক। আস্তে আস্তে নুয়ে পড়ে লীলার মুখ।

সহসা সে দুই হাতের মধ্যে তুলে নেয় মুখমণ্ডল, তুলে ধরে, লীলার চোখ বুজে যায়, ঠোঁট কাঁপে। তৃষ্ণার্ত সে কম্পিত ঠোঁটের ওপর ঠোঁট নামায়, লীলা যেন ছটফট করে, অস্ফুটে বলে—না-না। দৃঢ় আলিঙ্গনে বাঁধতে বাঁধতে সেও যেন প্রতিধ্বনি করে—না!—না।

লীলাবতী—সেই দুরন্ত নদী এখন স্থির। এখন এক শান্ত প্রকৃতিকে শান্ত পুরুষ এক শান্ত প্রকৃতিকে শান্ত হাতে শুয়ে শুয়ে আদর করছিল। তার নরম চুলে আঙুল ডুবিয়ে ডুবিয়ে চুপি চুপি বলছিল ঘুমিয়ে পড়ো···ঘুমিয়ে পড়ো···

—আমি যাই। আমি যাই।—অস্ফুট গলায় লীলা বলে—তারপর সে খাট থেকে নেমে মুখ প্রায় বুকের সঙ্গে মিশিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায়।

হঠাৎ চমকে উঠল সে। জানালার খড়খড়িতে কি শব্দ হ'লো? বাইরে কার যেন মৃদু গোঙানি। ক্রমশঃ সেই গোঙানির শব্দ দূরে সরে যেতে যেতে এক সময় মিলিয়ে গেল। সে চুপচাপ বিছানায় বসেছিল, যেন প্রাণহীন। একটা হিমেল স্রোত পা বেয়ে উঠতে উঠতে এক সময় তার সমস্ত শরীরকে ছেয়ে ফেলল।

ভোর হ'য়ে আসছিল। দু একটা পাখীর ডাক ভেসে আসছে। সে চমকে উঠল,—এখন? সেই লোকটা দিনের আলোয় মুখোমুখি জবাবদিহি?···না—না ···লজ্জা···সঙ্কোচ···সকালেই কলকাতার কোন ট্রেন আছে?

অসুস্থের মতো বিছানা থেকে নামল সে। সুটকেশ থেকে প্রায় কিছুই বার করা হয়নি। একটা মোটা সুতির পাঞ্জাবি পরে এসেছিল সেটাই চলছে। ওটাই টেনে নিয়ে গায়ে দিলো। সুটকেশটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে এলো। চটিটা যেন সে কিছুতেই ঠিকমতো পায়ে গলিয়ে নিতে পারছিল না। উঠোনের ওপারে তাকালো—লীলার ঘরের দরজা বন্ধ। উঠোন পেরিয়ে নিঃশব্দে দরজা খুলল সে, বাইরে এসে দরজা ভেজিয়ে দিলো। দ্রুত হাঁটছিল সে। ত্রস্ত হরিণের মতো তার পদক্ষেপ।

ষ্টেশনে পৌঁছে সে হাঁপাচ্ছিল। চায়ের দোকানটা কোনরকমে পেরিয়ে এসেছে, একবার তাকায়নি পর্যন্ত। কিছুক্ষণের মধ্যে একটা গাড়ী আছে।

টিকিটের জানালায় চার পাঁচজন লোকের মাত্র লাইন। অস্থির সে সকলকে ছাড়িয়েই টিকিট কাটতে যাচ্ছিল। একজন প্রতিবাদ জানাতে সে লজ্জিত ভাবে পিছনে এসে দাঁড়ালো। গরম লাগছিল, চাদরটা খুলে ভাঁজ করে হুটকেশে ঢোকালো।

ট্রেন এলো। একটা জানলার ধারে বসল সে। ভীষণ গরম লাগছিল।

অনেকক্ষণ হ'য়ে গেল কিন্তু ট্রেন চলছিল না। কামরার সকলে আস্তে আস্তে অস্থির হ'য়ে উঠছিল। জানালা দিয়ে মুখ বার করে এপাশ ওপাশ দীর্ঘ প্লাটফরম্ দেখল সে—শূন্য। ট্রেনের সামনের দিক থেকে কয়েকজন আঞ্চলিক লোক জটলা করতে করতে প্লাটফরম্ দিয়ে হেঁটে আসছিল, কাছাকাছি আসতেই সে জিজ্ঞাসা করল—কি হ'য়েছে?

—একটা মাতাল নেশার ঘোরে রাত্রে কখন কাটা পড়েছে, পুলিশ এসেছে, লাশ সরানো হচ্ছে,—বলতে বলতে তারা চলে গেল।

স্তব্ধ ট্রেন। কিন্তু তার বুকের মধ্যে যেন ট্রেনটা দ্রুতবেগে দাপিয়ে ঢুকে পড়েছে···সে কি? সে?···না···না···সে কেন হবে?—সে ছটফট করছিল।

ট্রেন মন্থর গতিতে চলতে শুরু করেছে। প্লাটফরম্ পেরিয়ে এলো। কতগুলি লোকের জটলা। তারপর বিস্ফারিত চোখে সে দেখল লাইনের পাশে রক্তাক্ত মৃতদেহ শুইয়ে রাখা—দেখল পরিচিত মুখ!

দ্রুত গতিতে ট্রেন একটা ক্রশিং পার হচ্ছে, ঠা—ঠা—ঠাস্—ঠাস্ শব্দ প্রচণ্ড উন্মাদনায় মাথার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। সহসা দুপাশে ছুটে এলো শালবন—সরল দীর্ঘদেহ গাছেরা চারপাশে ছুটোছুটি করছিল কি অস্থিরতায়, আর ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলছিল।- সে দুহাতে মুখ ঢাকতে চাইল কিন্তু [illegible] হাতে ভেসে উঠল লীলার নমনীয় মুখ শান্ত দৃষ্টি। কম্পিত দুই হাতে মুখ ডুবিয়ে সে অনুভব করছিল লীলা তার জীবনের সাথে কী অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে গিয়েছে।

সে পরবর্তী ষ্টেশনের জন্য অপেক্ষা করছিল।

সুনীলেন্দু কোনারের গল্প
রসিক-চরিত

গাঁয়ের নাম ভাতকুণ্ডা। তার মানে অঢেল ভাতের সঞ্চয় এখানে। বড়লোকেরা বলে, এ গাঁয়ে তো বটেই, এ তল্লাটে কখনো ভাতের অভাব নেই। অথচ ইতরজনেরা বলে বিপরীত কথা। আঁতকাঁকুলি হেঁচা কঘর ভদ্রলোকও বলে একথা। বলে গাঁয়ে ভাত আছে ঠিকই তবে পাল্লার ভার সমান নেই। সে ভাতের একটা কণাও ছিটকে বেরিয়ে আসতে পারেনা বড়লোকদের দরজার কোঁকড় গলে। ফলে ওদের যেমন ভাতের অভাব নেই, এদের তেমনি অভাবের অভাব নেই।

এমনি অবস্থা রসিক গাঁতরারও। দিনমজুর সে। খাটে খায়। বাপ সখ করে তার নাম রেখেছিল রসিক। কে জানতো এই রসিক নিজের সংগেই এমন বড় রকমের রসিকতা করবে। এমন বেরসিক দুনিয়া সবাইকে করেছে নিরস। করেছে রসিক আর তার সংসারটাকেও।

এই রসিকের একটা বউ ছিল। এখনো আছে ছেলে গোটা পাঁচেক। সব লেঙিগেঙি। আরো হত। সে বছর ভাদর মাসের টানাটানিতে পেট যখন আর চলছিল না তখন একদিন কারা সব যেন বললে গঞ্জের হাসপাতালে খাসি হয়ে এলে গরমেন্ট টাকা দিচ্ছে। দশ বিশটা দিন ওতে বেশ চলে যাবে। লোভার্ত হয়েছিল রসিকও। আরো ছিল, কে বলল যেন এতে আর ছেলে হবে না। ছেলের কচি কান্না শুনতে হবে না যেমন তেমনি মানুষ করার খেতে দেওয়ার ঝক্কি নেই। অতএব ক্ষুধার্ত রসিক লোভার্ত আরো অনেকের সঙ্গে গঞ্জের হাসপাতালে গিয়ে খাসি হয়ে এসেছিল। পরে দিনকতক, পা-টা তার শিরটানা গোছের হয়ে থাকলেও অল্প দিনেই আবার সব ঠিকঠাক। মাঝখানে কদিন পেট ভরে খেতে পাওয়া আর নতুন আঁতুর ঘরের বায়না না শোনা। কাজেই খুশী হয়েছিল রসিক।

রসিকের বাপ ঠাকুরদা কোন দিন সুখী হয়নি, রসিক হবে কি। অমন তাদের বংশগত ধারাবাহিকতা অস্বীকার করবে কার সাধ্যি। সমাজ কতোটা বদলেছে, তাই তাদের বংশের ধারা বদলাবে। কাজেই সে কদিন রসিক খুশী

হলেও, সুখী হতে পারেনি। তাতেও আফশোষ নেই। দিন কাটলেই কৃতার্থ। বরং হঠাৎ সূর্য্যটা মেঘের ঐ টুকতাল থেকে একদিন ছেড়িয়ে পড়ে গেলেই সে বেদনার্ত হবে। কে জানে তেমন আজব ব্যাপার কখনো ঘটবে নাকি? ভাবে রসিক সময় সময়।

এমনি করে দিন যেতে যেতে বছর ঘুরে আর এক ভাদর এলো বানের জলের মতন। অমনি যেন সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়। লাল জলের মত চারদিক পানে শুধু খিদে খিদে আর খিদে। পেট সব সময় আঁতকাঁকালহীন। মাথার সূর্য্যটার ছেড়িয়ে পড়ার কথা ভাবে রসিক, আর এখন দেখে নিজের মাথাটাই কেমন ছেড়িয়ে পড়ে অহরহ। কাজ নেই কোথাও, তাই খাবারও নেই। অথচ মুখপোড়া পেট আছে। কাবলীঅলার লাঠির মতন তাড়না তার। তাকে সামাল দেবার অস্ত্র নেই রসিকদের ঘরে। এমনি করে এ ভাদরে আধ-উপোষে যাচ্ছিল ক'দিন। বৌকে তাই রসিক বাপের বাড়িতে রেখে আসতে চাইল। বউটা যেতে চাইল না। বলল, 'আমার বাপের ঘরেও তো অভাব। ঘর বদল করলে কি হবে? অভাবকেই আসলে···

ধমকে দিয়েছিল রসিক। এবং একরকম জোর করেই তাকে রেখে এসেছিল তার বাপের ঘরে। বাপটাও চমকে উঠেছিল ওদের দেখে। তারপর ছ'দিনের দিন রসিক সংবাদ পেলো তার বৌ মরেছে। বিষ খেয়েছে। কাঁচ পোকা ফলকে গুঁড়িয়ে। সঠিক খাবার চিনেছিল। এ খেলে আর কখনো খেতে হয়না। হাজার অভাবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এরাও বাড়ে। এমন জিনিষ খাবার লোভ অভুক্ত রসিকের বৌ কেমন করে সামলাবে। তাই রসিক শুনলো তার বৌ মরেছে। শোক পেল রসিক। কাঁদল, ছেলেগুলোর দিকে চেয়ে, চোখ মুছল। মনে মনে বলল, পেট বাঁচাতে তুই যদি অমন জবাই হবি, তবে আমি আর অমন সেবার খাসি হলাম কেনে পেটের লেগে।

এ বছরই রসিক শুনল তার মতন অবস্থা হয়েছে পাশের গাঁয়ের রুস্তম সেখের। খাবার অভাবে তারও বৌ মরেছে কুঁচলে ফল খেয়ে। সে ভাবল, এমন অবস্থা তাহলে শুধু তার নয়। আরো অনেকের হতে পারে। কে জানে কতোজনাকার হচ্ছে। কতো গাঁয়ে, কে হিসাব রাখছে তার।

সেই থেকে রসিক আর রুস্তম বন্ধু হয়ে যায়। তারা সহমর্মী। পরস্পরকে দেখে বুক বাঁধে তারা। পরস্পরের গাঁয়ে মাঝে মাঝেই দেখা হয়। দু দণ্ড বসে সুখদুঃখের গল্প করে। বিড়ি টানে আর বেদনার আবর কাটে।

বৌয়ের কথা ভাবে রসিক। মাঝে মাঝেই ভাবে। ভাবে ভাদরের হাড়র ক্ষিদের কথাও। পেটের মতন অমন শত্রু তাদের কেউ নেই। ভাদরের এই পেট সেবার নিল তার ভবিষ্যৎ বংশধরদের, আর গত ভাদরের রাক্ষসী-হাত নিয়েছে তার বৌকেই স্বয়ং। সবরকম ক্ষিদেকে তো নিয়েছেই, সেই সংগে এমনকি সময়ে জুটলে ছেলেগুলানের ক্ষিদের মুখে দুটো ফ্যানভাত ফুটিয়ে দেবার ভান হাতটাকেই নিয়েছে কেড়ে। সব নিয়েছে। রসিক ভাবলো এই ভাদর এক দুনিয়া-জোড়া ডাইনী। ক্ষিদে এর মেটেনা। যেন সেই ধর্মের গল্পে শোনা বকাসুরের মতন। দৈনিক তার একেক ঘরে একটি করে মানুষের পালা। এরও তেমনি বছর ঘুরে একটি করে পালা। এক এক ভাদর আসে, কাউকে না কাউকে খেয়ে যায়। বুক মন পুড়িয়ে খাক করে যায়।

এই কথাই সে বলছিল একদিন রুস্তমকে। 'বুঝলে ভাই, এই আমাদের কপাল। গরিব প্রেজা আমরা বকাসুর মারতে ভীম আর আসেনা। অথচ একে না মারলে আর যে বাঁচিনে।'

বকাসুরের গল্প শুনে রুস্তম অবাক হয়ে বলেছিল, 'আশ্চয্যি কথা শোনালে রসিকভাই। তোমাদের ঐ বকাসুর তো আমাদের ধর্মেও আছে। খালি নাম দুটো যা আলাদা। তাদের একজনের নাম আকানন্দ আর তার ভাই বাঁকানন্দ। তাদের মারতে এসেছিল স্বয়ং পীর গোরাচাঁদ।'

—তাহলে দেখছি ভাই, বকাসুর আর আকানন্দ সব জায়গাতেই আছে সব ঘরেই কিন্তু তাদের মারতে কি আর ভীম গোরাচাঁদ আসবে না?

—ভারী কঠিন প্রশ্ন করলে ভাই।' রুস্তম বলে। তারপর হঠাৎ এক গভীর চিন্তায় ডুবে যায় তার মন। একটা কথা মনে পড়ে যায়। কোথায় যেন শুনেছিল সে বোধহয় লছিমপুরের হাটে। অমনি হঠাৎ সে বদলে যায়। বলে ওঠে, 'তোমার হাতটা আমার এ হাতে লাগাও তো রসিকভাই। লাগাও, লাগাও শক্ত করে। কব্জিটা টেনে রাখো।'

যন্ত্রচালিতের মত রসিক তাই করে। হাতটা লাগায় রুস্তমের শক্ত হাতে। দিনমজুরের লাঙলধরা শক্ত কব্জি তাদের। 'ন'য়ের মতোন'—বলত রসিকের বৌ। —ঠিক। 'এবার দেখোতো দুটো হাতের কতো শক্তি। এরাই আমাদের ভীম গোরাচাঁদ, বুঝলে রসিকভাই। বকাসুর মারতে এদেরই ঘুম ভাঙাতে হবে আগে।'

এক আশ্চর্য প্রত্যয় নিয়ে ঘরে ফিরে এসেছিল সেদিন রসিক। নিজের হাত

দুটোর দিকে তাকিয়ে ভেবেছিল, 'সত্যিই তো, এরাই তীম। এতোদিন তো একথা ভাবিনি। রুস্তম ভায়ের বুদ্ধি সুদ্ধি আছে। ভালো জিনিষ আগে টের পায়। আর বুঝিয়ে বলতেও পারে বেশ। পথ চলতে দু-পাশারি যত লোকের মুখোমুখি হয়েছে, তাদের সবায়ের হাতগুলোর দিকে তাকিয়েছে রসিক। যার হাত শক্ত। এত হাত। এত অজস্র হাত।

কিন্তু এতো ভাবনাই সার হয় তাদের। ঘরে ডাকাত পড়লে মনের আর ঠিক থাকে না। আবার অভাব আসে। অভাবের তাড়নায় সবাই তখন পাগলা কুকুরের মত মাথা ঢেলে বেড়ায়।

এবারের ভাদর এলো এক কঠিন ভাদর। শাওনের পরে আর জল নেই কোথাও, শুধুই খরা। খাঁ খাঁ করছে প্রকৃতি। ফেটে চৌচির হয়েছে মাঠ। খানাখন্দে যে জল আছে অল্পস্বল্প সে নিয়েই চলেছে গরিব চাষীদের জীবন মরণ লড়াই। আর ভরসা নেই রসিকদের। না তাদের পেটের, না তাদের জীবনের।

ক্রমাগত অনাহার চলছে। একদিন, দুদিন, তিনদিন, চারদিন। এমনি আরো কয়েকটা দিন! তারা দুসময় চলছে রসিকের। ছেলেগুলোরও সমান উপোস চলছে। কারা যেন সব সখ করে উপোস করে গবর্মেন্টের সামনে। শুনেছে রসিক। উপোস উপোস খেলা। ছেলেবেলার রাজা রাজা খেলার মতন। অমন রাজা-খেলা রসিকও খেলত। এখন হয়ত তার উপোসী ছেলেরাও খেলে রোজ। উপোসের নিজের রাজত্বে তার ছেলেরা সত্যিই রাজা। কেউ রাজা, কেউ সেনাপতি, কেউ মন্ত্রী।

হঠাৎ একদিন বৃষ্টি হলো। লোকেরা অনেকেরাই ছেড়ে বাঁচলো। মাঠে মাঠে জল দাঁড়িয়েছে আবার। খানাখন্দ ভরেছে। কদিন একটানা উপোস দিয়ে হাত পায়ে 'খাল' আঁখছে রসিকের। কিন্তু আলিস্যি করে বসে থাকলে চলে না। জল পড়ে ডোবায় জল দাঁড়িয়েছে। নালাতেও জল চলছে। মাঠেও জল দাঁড়িয়েছে। কাজেই ডোবা-ছিঁচে, জালি বেঁকে দুটো চ্যাং পুঁটি মাছেরও সংস্থান করতে পারলে পেট ভরবে। তাই সব আলিস্যি ঝেড়ে ফেলে সে বেরিয়ে যায়।

সারাদিন খালায় ডোবায় ঘুরে বিকেলে চাট্টি মাছ নিয়ে ঘরে ফেরে রসিক। সেই মাছ পোয়া পোয়া চালের ভাগ করে বেচে আসে গাঁয়ে। পোয়া তিনেক চালও হয় তাতে। বহুদিন বাদে ঘরের উনোনে আবার আগুন দেয় রসিক। ভাতের হাঁড়িটায় হাত দেয়। শুকনো খড়খড়ে হাঁড়িটায় ধুলোর ছাতা পড়েছে। গামছার খুঁট দিয়ে অত্যন্ত যত্ন করে অন্ততঃ একটা দিনের জন্যেও তার হাঁড়ির

ধুলো মোছে। ক্ষুধার্ত ছেলের চোখের জল মোছার মত। নিজের চোখটাও একটু ভিজে আসে রসিকের। হয়ত আনন্দে। অনেকদিন পর আসল খেতে পাওয়ার আনন্দে। সারাক্ষণ তার ছেলেগুলো উনোনের পাশে ঘোরাফেরা করল। উল্লাসের আতিশয্যে তারা অধীর।

ভাত ক'টা ফুটিয়ে রেখে রসিক দোকানে যায় টুকচেন নুন আর দুটো শুকনো লংকা আনতে। এমনিতেই কদিন না খেয়ে মুখের স্বাদ গেছে মরে। তাই নুন লংকা তার নাহলেই নয়। এতদিন বাদে যখন চাট্টি খাবে, একটু তৃপ্তি করেই খাবে। দোকানে ভোলা দোকানীর সংগে কথা বলতে গিয়ে ফিরতে তার একটু দেরীই হল। আর বাড়ি ফিরে মাথা ঘুরে গেল তার। এক ভয়ানক দৃশ্য দেখল সে।

সে দেখল, তার দোকান যাবার ফাঁকে তার ক্ষুধার্ত ছেলেরা তার হাঁড়ির সব ভাত ঢেলে নিজেরাই খেয়ে নিয়েছে চেটেপুটে। ভালো করে হাঁড়িটায় নজর করে দেখল রসিক। না, এককণা ভাতও তার জন্যে অবশিষ্ট নেই। এদিকে পেটে তখন রাক্ষুসী ক্ষুধা তীব্র বেগে হাত পা ছুঁড়ছে। এ এক অসহ্য দুরবস্থা রসিকের। কান্না পেল তার। প্রচণ্ড রাগ আর বিরক্তি নিয়ে ছেলেমেয়েগুলোর দিকে তাকাল সে। এক দুই তিন চার পাঁচ। আহা কতোদিনের অনাহারী করুণ ক'টি কচিমুখ। অনেকদিন বাদে হাঁড়িতে ভাত দেখে ধৈর্য্য ধরতে পারেনি তারা। পেটপুরে খেতে গিয়ে পুরো হাঁড়িই উদ্ধার করে দিয়েছে। বাবার কথা মনে পড়েনি তাদের। অকম বাপ সে। তাদের মুখে হাসি ফোটাবার দায়িত্ব তারই। অথচ…। হু হু করে চোখের জল ঝরতে থাকে রসিকের। অনাহারী রসিকের—বাড়া ভাতে ছাই-পড়া রসিকের। দুনিয়ার সমস্ত কিছুর মূল্যবোধ হারিয়ে যায় তার কাছে। নিজের দেহের দাবীর কাছে, নিজের বিবেকের কাছে, নিজের অস্তিত্বের কাছে নিজেই নিঃশেষ হয়ে ভেঙে চুরমার হয় রসিক।

পাগলের মত ঘরের মধ্যে ছটফট করতে থাকে রসিক। খিদের মুখে কিছু না থাকলে সহ্য হয়। কিন্তু থাকলে যেমন খিদে আরো বাড়ে, তেমনি থাকা জিনিষ অন্যের পেটে চলে গেলে খিদে আর সহ্য হয়না। ইচ্ছে হয়, খাবার খেয়ে নেওয়া মানুষগুলোকেই বুঝি খেয়ে নেওয়া চাই। তাতে পেটও ভরে, শত্রুও মরে।

কিন্তু আশ্চর্য, রসিক ছেলেগুলোর দিকে তাকিয়ে কিছুতেই তাদের শত্রু

ভাবতে পারেনা। এ শিশুরা তো তারই সন্তান। এদের পেট তো রসিকেরই দেহের অংশ। তবু তাদের পেট ভরায় রসিকের পেট তো ভরে যায়না। নিজের কথা নিজের কানেই বাজে, 'গরীব প্রজা আমরা, বকাসুর মারতে ভীম গোরাচাঁদ আর আসেনা। অথচ এদের না মারলে আর যে বাঁচিনে ভাই।...'

এসব কথা মনে হতেই, আচমকা রসিকের আচরণ বদলে গেল। সে হঠাৎ হাত বাড়িয়ে চালের বাতায় গুঁজে রাখা বিষের শিশিটা টেনে নামাল। তার তীব্র ইচ্ছা জাগল, পরের জন্মে সে যেন ভীম গোরাচাঁদ হতে পারে। এ জন্মটা তার বৃথাই গেল। গরীব প্রজার যেন ভীম গোরাচাঁদে জন্মান্তর ঘটে!

বিষের নীলে তলিয়ে যেতে যেতে রসিকের মনে হল ছেলেগুলো তার আবার কেঁদে উঠল। কাঁদছে। কেন কাঁদছে? সে নিজে কত কেঁদেছে। ছেলেরাও কাঁদছে। কেন যে সবাই এমন কাঁদে। রক্তমতাদের কথা মনে পড়ল তার। মনে পড়ল কত হাত। অজস্র হাত। বুকের ভেতর বারুদের শক্তি নিয়ে একা একা সব হাতগুলো ঘুরছে।

ছেলেগুলো সব পাশাপাশি শুয়ে ঘুমুচ্ছে। পরিতৃপ্ত পেটের আয়েসী ঘুম। তবু তাদের চোখে জল। কণ্ঠে তাদের কান্না। রসিকের সংগে একি রসিকতা। শ্লথ হাত বাড়িয়ে ছেলেগুলোর হাতগুলো পরস্পর জুড়ে দিতে তৎপর হল রসিক। কিন্তু বিষ ততক্ষণে তার শরীরকে গুঁড়িয়ে ফেলছে। সে হাত নাড়তে পারছেনা। ক্রমশঃ সব যেন চেতনার বাইরে চলে যাচ্ছে। আবার সে চেষ্টা করল। আবার সে চেষ্টা করল। আবার। ব্যর্থ হল।

অমনি আশ্চর্য এক আক্রোশ জন্মাল নিজের প্রতি। নিজের বোকামির জন্য। বেঁচে থাকার মন্ত্রটা তো ছেলেদের সে দিয়ে যেতে পারল না। সারা জীবনের সঞ্চয় দিয়ে যে মন্ত্রটা সে আয়ত্ব করছে, সেটা ছেলেদের দিয়ে যেতে হবে। বেঁচে ওঠার ভীষণ ইচ্ছায় সে ছটফট করে ওঠে। কী চরম বোকামি করল সে। এখন যে তার বেঁচে থাকা অত্যন্ত দরকার। তার ছেলেদের জন্যেই। ঐ তো এখনো শোনা যাচ্ছে তার অসংখ্য শিশুদের কান্না। বিড় বিড় করে রসিক উচ্চারণ করে, 'বেঁচে ওঠো রসিক। বেঁচে ওঠো। তোমার ছেলেদের বাঁচবার ব্যবস্থা করে যাও।'

কৃশানু'র দশম বর্ষ পূর্তি এবং 'কৃশানু' পুরস্কার বিতরণী সভা

গত ৯ই আষাঢ় ১৩৮৫ (২৪শে জুন, ৭৮) তারিখে ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভাগৃহে কৃশানু সাহিত্য পত্রিকার দশম বর্ষপূর্তি ও পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত হরিপ্রসাদ ভৌমিকের স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত প্রথম বৎসরের 'কৃশানু' সাহিত্য পুরস্কার প্রদান উপলক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠান আমাদের, বিশেষতঃ আমরা যারা এই পত্রিকার সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছি বিগত এক দশক যাবত, তাদের পক্ষে ছিল বিশেষ আনন্দের।

মাসটা ছিল আষাঢ়, কেবল আক্ষরিক ভাবেই নয়, কার্যতও তাই। সকালটা ছিল মেঘমেদুর, অপরাহ্ণ থেকেই অবিশ্রান্ত বর্ষণ, আকাশ জুড়ে নবীন মেঘের উচ্ছলতা। রাস্তায় জল জমে ট্রাম বন্ধ, বাস চলাচল প্রায় বিপর্যস্ত। এমনি এক বর্ষণমুখর শনিবারের সন্ধ্যা কোনক্রমেই অনুকূল ছিল না কোন রকম সভা-অনুষ্ঠানের। বরং ঘরের কোণে বসে চলতে পারে এল. পি. অথবা ই.-পিতে বর্ষামঙ্গল, নিদেন পক্ষে উন্মুক্ত গবাক্ষের পাশে বসে ভাবনা চলতে পারে বিরহী যক্ষিণীর কথা।

আমরা যারা এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা, তাদের অনেকেই হাজির হতে পারছিনা সময়মত। শেষ পর্যন্ত সকলে উপস্থিত হতে পারবেন, সে বিষয়ে ছিল দারুণ সংশয়। না, শেষ পর্যন্ত সকলেই হাজির হলেন একে একে। হাজির হয়েছেন কৃশানু পুরস্কারের প্রথম বছরের প্রাপক বিজনকুমার ঘোষ, সপরিবারে। কিন্তু বৃষ্টির শেষ নেই, তখনও টিপটিপ পড়ছে।

এর পরে নিমন্ত্রিতদের সম্পর্কে ভাবনা। তাঁরাও আসতে শুরু করলেন, এই প্রচণ্ড দুর্যোগ উপেক্ষা করে। কলকাতা থেকে এলেন, তার আশপাশ থেকে, এমনকি কলকাতার অনেক দূরের হুগলী, চব্বিশ পরগণার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেও এলেন লিটল ম্যাগাজিনের সংগঠক কিছু কিছু সাহিত্য নিবেদিতপ্রাণ তরুণ। প্রবীণ-নবীন লেখক কবিরা এলেন, এলেন কৃশানুর মুদ্রাকর, বাঁধাইকার, নানান পৃষ্ঠপোষক এবং ঘনিষ্ঠ দরদী-পাঠকরা। ছোট্ট হল ঘরটা যেন নিমেষে ভরে গেল। যাঁরা এলেন না, অর্থাৎ আসতে পারলেন না, তাঁদের সংখ্যা, যারা

উপস্থিত হয়েছেন তাঁদের চেয়ে বহুগুণ বেশী। আবহাওয়া অনুকূল থাকলে, আমরা বসার জায়গা দিতে পারতাম না উপস্থিত সকলকে। সেটাই মন্দ-কী। ঘরোয়া এই সাহিত্য-সভা রূপ নিতে পারত এক জমজমাট পথ-সভার।

যথাসময়ে শুরু হল সভার কাজ উদ্বোধনী গান দিয়ে। সভাপতি ও প্রধান অতিথির নাম প্রস্তাব করলেন রত্নেশ্বর বর্মণ, সমর্থন করলেন কৃশানুর কর্মাধ্যক্ষ মদন দাশ। সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন কৃশানু সাহিত্য সংস্থার সভাপতি জ্যোৎস্নাময় বসু, প্রধান অতিথি প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। সভাপতি প্রধান অতিথিকে মাল্যদান করল, ছোট্ট একটি সোনা মেয়ে। উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানালেন—সাহিত্য সংস্থার যুগ্ম-কর্মসচিব সুনীল চক্রবর্তী। শ্রীচক্রবর্তী তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বর্ণনা করলেন, কৃশানু পুরস্কার প্রবর্তনের পরিপ্রেক্ষিত। কৃশানু পত্রিকার সম্পাদক দীনেশচন্দ্র সিংহ তাঁর দীর্ঘ, ভাষণে বিবৃত করলেন কৃশানু পত্রিকার অনেক ঘরোয়া কাহিনী। জানালেন সংগঠকরা কী কষ্ট করে পত্রিকাটিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

এর পর স্বাগত জানান হল পুরস্কার প্রাপক বিজনকুমার ঘোষকে। মাল্যদান করলেন কৃশানু পত্রিকার সম্পাদক। মানপত্র পাঠ করলেন পিনাকীরঞ্জন গুহ। আটাত্তরের কৃশানু পুরস্কারের স্মারকগুলি প্রদান করলেন সভাপতি জ্যোৎস্নাময় বসু। বিজনকুমার ঘোষ তাঁকে পুরস্কার প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানালেন পুরস্কার-দাতাদের। এবং জানালেন, তাঁকে যে সম্মান জানান হল, তিনি তার যোগ্য হবার চেষ্টা করবেন।

এরপর প্রধান অতিথির ভাষণ। প্রধান অতিথি সিরাজ সাহেব সভার অন্যান্য বক্তাদের মতোই আনন্দ প্রকাশ করলেন 'কৃশানু' পত্রিকার দশম বর্ষপূর্তিতে। তিনি আরও আনন্দ প্রকাশ করলেন তাঁহার সহকর্মী অনুজ-প্রতিম বিজনকুমার ঘোষের পুরস্কার প্রাপ্তিতে। বাংলা সাহিত্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করলেন যে, সত্যিকারের সিরিয়াস সাহিত্যের চেয়ে প্রাধান্য পাচ্ছে নৃত্য-গীত-নাটক ইত্যাদি 'পারফরমিং আর্টস'। সিরাজ সাহেবের বক্তৃতার পরেই জনৈকা মহিলা শ্রোতা এ বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করলেন তাঁকে। বোঝা গেল, প্রধান অতিথি একটি আকর্ষক বিতর্কের সূচনা করলেন। কার্যত তাই হল, পরবর্তী বক্তা সাংবাদিক সাহিত্যিক পার্থ চট্টোপাধ্যায় 'পারফরমিং আর্টসে'র প্রাধান্য কেন তা সুন্দর ভাবে বিবৃত করলেন। এরপরের বক্তা প্রখ্যাত কবি কৃষ্ণ ধর এই প্রসঙ্গ আলোচনার যবনিকা টেনে বললেন—আমাদের মত

শিক্ষায় পশ্চাৎপদ দেশে 'পারফরমিং আর্ট'-এর রয়েছে সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের এক মহতী ভূমিকা। সভার অন্য বক্তা ছিলেন—রাণা বসু।

সভার সভাপতি জ্যোৎস্নাময় বসু তাঁর ভাষণে প্রধানত বিবৃত করলেন, কৃশানু পুরস্কার প্রাপক মনোনয়ন সম্পর্কে সংস্থার দৃষ্টিভঙ্গির কথা। চা-পান এবং সংস্থার সহ-সভাপতি কিরণচন্দ্র মৈত্রের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে সমাপ্তি হল সেই আষাঢ় সন্ধ্যার মনোগ্রাহী সভানুষ্ঠান। এই সকল অনুষ্ঠানের পেছনে আরও অবদান ছিল কয়েকজনের—যেমন প্রভাস ভদ্র সারাক্ষণ দরজা আগলে বসে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন সমস্ত অভ্যাগতকে, আপ্যায়নের দায়িত্ব নিয়েছিলেন বকুল ঠাকুর।—তা ছাড়া সংস্থার তিন তরুণ সদস্য রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়, কাশীনাথ দাশ চাকলাদার এবং প্রণব পাল আয়োজন করেছিলেন আকর্ষণীয় প্রদর্শনীটির, যাতে সাজান ছিল—গত দশ বছরের কৃশানু পত্রিকার সমস্ত সংখ্যাগুলি। এছাড়া নেপথ্যে থেকে যিনি সমস্ত ব্যবস্থাপনার নেতৃত্ব করছেন, তিনি হলেন সংস্থার অন্যতম কর্মসচিব শান্তিরঞ্জন চক্রবর্তী।

—রত্নেশ্বর বর্মণ

রুশানু

একটি সাহিত্য পত্রিকার নাম

রুশানু

পত্রিকার গ্রাহক, পাঠক এবং লেখক হোন।

রুশানু

একটি সাহিত্য সংস্থার নাম

রুশানু

সাহিত্য সংস্থার সদস্য হোন

নাটক নিয়ে বিশুদ্ধ পত্রিকা

নাট্য-লিপিকা

পূর্ণাঙ্গ—একাঙ্ক—নাট্যচিন্তা এবং বিবিধ নাট্যতরঙ্গ

নিয়মিত এতে থাকছে

নাট্যসংস্থাগুলি অবিলম্বে খোঁজ নিন

শারদ-সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে

দপ্তর : ৩০/১-এ, কলেজ রো, কলকাতা-৯

Space Donated by

FRIENDS ROADWAYS

TRANSPORT & LABOUR CONTRACTORS.
(Specialist in Dock Works)

34, S. K. Deb Road, (5th by Lane),
CALCUTTA-48.

KRISHANU Vol. XI No. I Regd. No.
Quarterly Rs 3·00 RN 16533/68

with compliments of

British Paints

শ্রীমলিন দত্ত কর্তৃক ৩০/১-এ কলেজ রো, কলি-৯ থেকে প্রকাশিত
এবং লক্ষ্মীনারায়ণ প্রেস, ৬ শিব বিশ্বাস লেন, কলি-৬ থেকে মুদ্রিত।